Hitesranjan Sanyal Memorial Collection
Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

Record No.: CSS 2006/ 10	Place of Publication: N.A.
Collection: Sharmadip Basu	Publisher: N.A.
Title: *Koibo katha kane kane*	Year of Publication: N.A.
	Size: 18.75 c.m. x 12.5 c.m.
Author: Nripendrakumar Basu (1898 – 1979); helped by Nirmala Basu	Condition: Good.
	Remarks: Hard bound copy. Total pages: 112. Title page, content list are missing; full page pictures are not included in numbered pages.

Microfilm roll No.: CSS	From gate:	To gate:

প্রেম ও আত্মা

[Louvre Museumএ রক্ষিত Gerardএর বিখ্যাত চিত্রের প্রতিকৃতি।]

কইব কথা কানে কানে

প্রথম বৈঠক

প্রেমে একনিষ্ঠা

বিয়ের দিন কয়েক পরেই একদল তরুণ দম্পতি আমার বৈঠকে এসে হানা দিয়েছে। তাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ—ব্যবহারিক প্রেমবিজ্ঞান সম্বন্ধে তাদের কিছু উপদেশ দিতে হবে। কিন্তু সবিনয়ে ও অবিনয়ে তাদের বল্‌ছি, আমার জ্ঞানের ভাণ্ডার অত্যন্ত ক্ষুদ্রায়তন, আমার উপদেশ-দানের শক্তি রীতিমতো সীমাবদ্ধ। অন্যত্র দেখ।....কে শোনে সে কথা!

গত পঁচিশ বছর ধোরে তোমাদের অনেককে অনেক উপদেশ দিয়েছি—দিতে দিতে আমার থলি উজাড় হোয়ে এসেছে, আমিও বৃদ্ধ হোয়ে পোড়েছি। তোমাদের মধ্যে কে কতখানি আমার উপদেশগুলো মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছ ও মেনে চলেছ তা আমি জান্‌তে চাইলেও সব ক্ষেত্রে জানতে পারিনি। যদি অর্ধেক সংখ্যক লোক বারো আনা উপদেশও মেনে থাকো এবং মেনে যদি সুখে থাকো, তাহলে আমি বুঝতে পারি যে, আমার উপদেশদানটা তেপান্তরের মাঠে সাহায্যের চীৎকারের মতো স্রেফ ব্যর্থ হয়নি।

তোমরা মেয়েপুরুষরা যারা আমার কাছে এসে আজ জড়ো হয়েছ, তারা অনেকেই একটা, দুটো, তিনটে, চারটে পরীক্ষার আগড় ডিঙ্গিয়েছে। তোমাদের অনেকের গায়েই চক্‌চক্ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সীলমোহরের

ছাপ্। তোমাদের কেউ কেউ ক্রীড়াক্ষেত্রে, গবেষণাক্ষেত্রে, রাজনীতিক্ষেত্রে, কর্ম ও অর্থোপার্জনের ক্ষেত্রেও এরই মধ্যে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছ। তার জন্যে আমার গর্বিত আত্মপ্রসাদের সীমা নেই। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ বিয়ের আগে পরনারী বা পরপুরুষের সংস্পর্শে এসেছ, তাদের অস্থায়ি-ভাবে ভালবেসেছ,—যদিও 'ভালবাসা' শব্দটা গম্ভীরভাবে ব্যবহার করতে আমি রীতিমত কুণ্ঠিত হচ্ছি। হয়তো যৌবনের অন্ধ অবুঝ উন্মাদনায় পরস্পরে পরস্পরের দৈহিক জ্ঞানও লাভ করেছ। কিন্তু এরকম স্ত্রীপুরুষের সংখ্যা আমাদের দেশে এখনো মুষ্টিমেয়। তবু নিকট থেকে বা অদূর থেকে ভাবগতভাবে কারো প্রণয়াসক্ত-হওয়া ছেলেমেয়ের সংখ্যা আমাদের দেশে অন্য দেশের তুলনায় বড় কম নয়।

কিন্তু বিয়ের আগে ও পরে যারা বাস্তব প্রেমের রাজ্যে প্রবেশ করেছে, তাদের খুব অল্প সংখ্যকই এ রাজ্যের আইনকানুন আগে থেকে ভালো কোরে অধিগত কোরেছে। অজ্ঞতার জন্যে তারা পদে পদে ঠেকেছে ও ঠকেছে।

বিয়ের আগে ও বিয়ের অব্যবহিত পরে তোমাদের সুখী কর্‌বার ও সুখী হবার জন্যে যেটুকু জ্ঞান সঞ্চয় করা দরকার, সেটুকু তোমাদের আমি সাদরে ও সাগ্রহে সরবরাহ করেছি। সুখের বিষয় তোমরা আরো কিছু জান্‌তে চাও, কারণ জ্ঞান অনন্ত অপার—বিশেষভাবে প্রেম সম্বন্ধীয় জ্ঞান। তোমাদের জ্ঞানের স্পৃহা অফুরন্ত হোক—জ্ঞানের প্রয়োগ ত্বরিত ও ত্রুটিশূন্য হোক্—এই আমার অন্তরের অকপট কামনা। কিন্তু আমি তোমাদের জ্ঞানের পিপাসা কতটুকু মেটাতে পার্‌ব ?···

প্রাচ্যভূখণ্ডের কামশাস্ত্র

তোমরা যখন এসেছ আশা নিয়ে, অগত্যা যতটুকু পারি মেটাই। কিন্তু এ জ্ঞানের উৎসমূল আমি নই, আমি বাহক মাত্র।···দু হাজার আড়াই হাজার বছর আগে থেকে আমাদের দেশে কামকলা সম্বন্ধীয়

বিদ্যা উৎকর্ষের তুঙ্গ-গিরি-পথে এগিয়ে চল্‌ছিল। এ বিদ্যায় এখনো বোধহয় ভারতবর্ষ জগতে অতুলনীয় ও অগ্রণী। মধ্যযুগের মর্মপীড়াদায়ক ধর্মানুশাসন ও মনুষত্ববিকাশের পরিপন্থী আচারানুষ্ঠানের তলায় এই বিদ্যা পড়েছিল চাপা। উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় জ্ঞানানুসন্ধিৎসু পণ্ডিতগণ ভারতীয় কামশাস্ত্রের জরাজীর্ণ কীটদীর্ণ পুঁথিগুলিকে বিস্মৃতি ও হতাদরের কবর থেকে বহু কষ্টে সর্বপ্রথম উদ্ধার করেন।

বাৎস্যায়নের 'কামসূত্র'-এর নাম তোমরা প্রায় সকলেই শুনেছ ; কেউ কেউ ওর বাংলা বা ইংরিজি অনুবাদ নিশ্চয়ই পড়েছ। বাৎস্যায়নের আবির্ভাব-তারিখ এখনো নির্ভুল ও সঠিকভাবে নির্ণীত হয়নি ; খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী ও খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি কোন সময়ে তিনি জীবিত ছিলেন—এ সম্বন্ধে আর সন্দেহ নেই। বাৎস্যায়ন ছিলেন তাঁর পূর্ববর্তী মনীষীদের বিক্ষিপ্ত জ্ঞানরত্নকণিকার সঙ্কলয়িতা এবং টীকাকার ; নিজেরও বৈদগ্ধ্য ও বহুদর্শিতার কথা তিনি সংক্ষেপে কিছু কিছু গ্রথিত করেছেন তাঁর "কামসূত্রে"। কামসূত্রের পর আরও বিশ-পঁচিশখানা ভালো ভালো কামতত্ত্ববিষয়ক পুঁথি দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে ও তার পরেও রচিত হয়েছিল। তার মধ্যে কোক্কক পণ্ডিতের "রতিশাস্ত্র" ও কল্যাণ-মল্লের "অনঙ্গরঙ্গে" কিছু কিছু মৌলিকত্বের নিদর্শন আছে। কিন্তু পরবর্তী কোন বইই কামসূত্রকে অতিক্রম যেতে পারেনি এবং অনেক স্থলে তার প্রশংসনীয় বা অসার অনুকরণ কর্‌তে দ্বিধা করেনি।

দ্বাদশ থেকে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে আরব, ইজিপ্ত, অ্যাল্‌জেরিয়া, টিউনিস্ ও ইরাণে কামকলা-কৌশল সম্বন্ধে ক'খানা ভালো ভালো বই রচিত হয়েছিল। এই সব বইয়ের মধ্যে শেখ নেফ্‌জাউই-এর 'সুরভি-কানন' সমধিক প্রসিদ্ধ। রোমেও খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে এ সম্বন্ধে একখানা ভালো বই লেখা হয়েছিল—ওভিদাস্ ল্যাসোর "আর্ট্ অব্ ল্যাভ্"। এই সমস্ত বই পড়লে জানা যায় যে, সে যুগে কামকলা প্রাচ্য

দেশসমূহে কত উন্নতিলাভ করেছিল। কামকে তখনকার কালের মনীষীরা ধর্ম ও অর্থের সঙ্গে সমপর্যায়ে রেখে, যথাবিহিত প্রণালীতে তার নিয়মিত সেবা করাটাকে গৌরবের বোলে মনে করতেন। কিন্তু কামকে তাঁরা ধর্ম বা অর্থের নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে কিছুতেই অনধিকার প্রবেশ করতে দিতেন না।

কামতৃপ্তি ও দাম্পত্যজীবন—তখন ও এখন

সে যুগের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক রীতিনীতি, আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ, লৌকিক জীবনযাপনের ধারা এখন যথেষ্ট বদ্‌লেছে। সর্বোপরি বিজ্ঞান এসে লোকযাত্রার পথে প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতা দূর কোরে দেবার—বহু সনাতন সমস্যার দ্রুত সমাধান কোরে দেবার অভয়-বাণী আপামরসাধারণকে শুনিয়ে দিয়েছে। কামপ্রসাদনের রীতি ও হৃদয়জয়ের অভিযানে তখনও যে সকল আইনকানুন ও প্রয়োগপদ্ধতি মানা হোত, এখনো মূলত সেইগুলোই মানা হয়। পতিপত্নীর মধ্যে পুত্রোৎপাদনের স্পৃহা বোধহয় সেকালের চেয়ে একালের নরনারীর মধ্যে অনেক কমেছে, কিন্তু তাদের মধ্যে ভোগস্পৃহা কিছুমাত্র কমেনি,—যদিও তখনকার তুলনায় সাধারণ মানুষের অর্থচিন্তা ও জীবনযাত্রার ধস্তাধস্তি বহুগুণ বেড়ে গেছে।

প্রধানত অর্থনৈতিক কারণে সকল দেশেই যেমন স্থায়ী ও বৈধভাবে কামতৃপ্তির বয়স পেছিয়ে গিয়েছে, তেমনি ভোগস্পৃহা প্রবল হবার বয়স সঙ্গে সঙ্গে পেছিয়ে যাচ্ছে না—সেটা ঠিকই আগেকার মতোই আছে। কাজেই মেয়েপুরুষ কামতৃপ্তির নানাপ্রকার কৃত্রিম প্রণালীর শরণ নিতে বাধ্য হচ্ছে। এসব কৃত্রিম প্রণালী কি কি তা তোমাদের কাছে অজানা নয়, কারণ তোমাদের প্রত্যেকেই বিয়ের আগে এর কোন-না-কোনটার সাময়িক দাসত্ব করেছ। যারা কায়িকভাবে কিছু করোনি, তারা অন্তত বাচিক বা মানসিকভাবেও আত্মরতি করেছ। এগুলো

না কোরেও কোন উপায় ছিল না, কারণ কাম মানুষের স্বভাবধর্ম এবং আজন্মের সাথী। কৈশোর থেকেই এ ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করে ও স্ফুরণের প্রণালী খোঁজে। কিন্তু কৈশোরে যৌবনে প্রৌঢ়ত্বে একে সুনিয়ন্ত্রিত করা, সময়-বিশেষে দমন করা ও সময়-বিশেষে এর প্রসাদনের রাজপথ উন্মুক্ত করা প্রত্যেক মনুষ্য-নামধারীর অন্যতম কৃত্য। এই কৃত্য বেদনাহীন সুস্থতার মধ্য দিয়ে আনন্দপ্রদ সাফল্যের সঙ্গে সম্পাদন করা—জীবনের একটা স্মরণীয় কৃতিত্ব।

বৈধভাবে কামপ্রসাদনের ব্যাপারে দুই পক্ষই যে সমান অংশীদার—তা এক পক্ষ, বিশেষভাবে পুরুষলোক, প্রায়ই ভুলে যায়। এমন কি, স্ত্রীলোকের দেহে-মনে যে কাম বোলে একটা বৃত্তি ও তজ্জনিত সুখের একটা প্রত্যক্ষ অনুভূতি আছে, সে সংবিদ্‌টা কেউ কেউ বিস্মরণীর চোর-কুঠুরিতে পুরে রেখে দেয়। আমরা যখন যে রাজ্যে প্রবেশ করি, তখন সে রাজ্যের আইনকানুন জানি ও মেনে চলি; কিন্তু নারীর দেহরাজ্যে যখন পুরুষেরা প্রবেশ করে ও হৃদয়রাজ্যে প্রবেশ করার প্রয়াস করে, তখন অধিস্বামিত্বের বলে তার ওপর তারা নিজের গড়া আইনকানুনই প্রয়োগ করতে যায়। তাতে সত্যিকারের দেহমনের মিল কখনই হয় না, একপক্ষের মনে বিদ্রোহ দানা বাঁধে।

নারীকে রাজ্যের সঙ্গে তুলনা করতে গেলে বলতে হয়—সেটা একটা সীমানাবদ্ধ স্থাবর ভূমিখণ্ড নয়, একটা জীবন্ত সত্তা। সেখানে পুরুষ যদি রাজাই হোতে চায়, তাহলে সে হবে বিলাতের রাজার মতো constitutional monarch; তাকে প্রজার তৈরি আইনের নাগপাশে বাঁধা থাকতে হবে অহরহ। যেদিন সে রাজ্যের আইন অমান্য করবে, সেদিন তাকে প্রজার শ্রদ্ধা ও সিংহাসন দুই-ই হারাতে হবে।

প্রেমরাজ্যের আইনকানুন ও দাম্পত্য-সুখভোগের কলাকৌশল সম্বন্ধে আমি তোমাদের যে সব তথ্য বলব, তা সমস্তই প্রাচ্য প্রেম-

বিশারদদের প্রাচীন প্রামাণিক গ্রন্থ থেকে মূলত আহরণ করা। আমার নিজস্ব মতবাদ ও টীকাটিপ্পনী পারতপক্ষে কোথাও বেশী দেবার চেষ্টা করব না। তবে প্রতীচ্য বৈজ্ঞানিকদের আধুনিক মতবাদ মাঝে মাঝে দেব; কারণ প্রেমকে একাধারে কলা ও বিজ্ঞানের আওতায় না আন্‌লে ওর সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই সম্পূর্ণ হয় না। বিশেষভাবে এই জ্ঞানকে স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে যাচাই না কোরে নিলে, এযুগে কোন লোকেরই কল্যাণ নেই।

জীবজন্তু ও অসভ্যদের দাম্পত্যজীবন

স্বাস্থ্য ও সমাজবিজ্ঞান সম্বন্ধে বেশী কথা তোমাদের বলতে পারব না এ বইয়ে। শুধু এইটুকু বল্‌তে চাই যে, একগামিতা বা এককালে একজনের সঙ্গে প্রেমের মধ্য দিয়ে লৈঙ্গ সম্বন্ধ স্থাপন হ'ল বিধাতার অভিপ্রায়। মন্ত্র পোড়ে, পুরোহিত মোল্লা ক্লার্জিম্যানের সাম্‌নে শপথ কোরে, আলো-ফুল-গানের পরবের মধ্য দিয়ে যে বিয়ে হয়, সে বিয়ে সব সময় মানুষকে—কি পতি কি পত্নীকে—পরস্পরের প্রতি চিরবিশ্বস্ত চিরাসক্ত চিরপ্রসন্ন রাখতে পারে না। বিয়ে না হলেও দুটি প্রাণের মধ্যে একমুখী গভীর ভালবাসা জন্মাতে পারে। আবার বিবাহিত পুরুষ একটি বিবাহ কোরে দশটির সঙ্গে প্রণয়লীলায় মাত্‌তে পারে এবং পত্নীকে অবহেলা করতে পারে। তবে বিয়ে হোক আর না-ই হোক্, যে দুটি মানুষ প্রণয়াবদ্ধ হবে, তারা তাদের প্রণয়কে যথাসাধ্য স্থায়ী করবার এবং পরস্পরের নিকট বিশ্বস্ত থাক্‌বার সাধনা করবে।

একগামিতা (monogamy) যে বিধাতার অভিপ্রায়, তার প্রমাণ আমরা পাই বহু উচ্চনীচ জীবের প্রণয়জীবন অধ্যয়ন কোরে।... জোঁক এক জাতীয় বকের নাম। এরা একটু সেয়ানা হলেই একজনকে

'বিয়ে' করে। বিয়ে মানে কি আর উৎসব কোরে—শাঁখ বাজিয়ে—উলু দিয়ে—মন্ত্র পোড়ে? তা নয়, একটা পুরুষ পাখী পাঁচটা স্ত্রী-পাখীর ভেতর থেকে একজনকে বেছে নেয়। দুজনে বাসা বাঁধে, একসঙ্গে বসবাস করে এবং ডিম ও শাবকদের লালনপালন করে। দু'জনে আজীবন পরস্পরের প্রতি একান্তসমর্পিতপ্রাণ থাকে। একজন মারা গেলে আর একজন কেঁদে কেঁদে না খেয়ে দিনকতক উড়ে বেড়ায়।...চখা ও চখীদের মধ্যে, বাবুই, ঘুঘু, শুক, চন্দনা, টুনটুনি প্রভৃতি পাখীদের মধ্যেও এইরকম এককেন্দ্রিক্ ভালবাসা দেখ্‌তে পাবে। আরো শত শত রকমের পাখির সন্ধান পাওয়া যায়, তারা আমরণ দম্পতির মত বাস করে।

শিম্পাঞ্জী, ওরাংউটাং, গরিলা প্রভৃতি নিষ্পুচ্ছ বনমানুষদের দাম্পত্য-জীবন অধ্যয়ন করবার মতো। সঙ্গী বা সঙ্গিনী অসুস্থ হলে অন্যজন দিবারাত্র অনাহারে অনিদ্রায় তার সেবাশুশ্রূষা করে। মারা গেলে মানুষের মতো কাঁদে; অন্য জানোয়ারকে তার স্থলাভিষিক্ত করতে চায় না কিছুতেই। এদের মধ্যে বিপত্নীক ও বিধবা ভূরি ভূরি পাওয়া যায়। সিংহজাতির মধ্যেও দাম্পত্য প্রেমের চূড়ান্ত নিদর্শন দেখতে পাবে। আরো কত রকমের পশু আছে—যারা তাদের প্রকৃতিদত্ত সামান্য বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে পরস্পরকে ভালবাসে এমন গভীরভাবে এবং পরস্পরের সুখদুঃখের এমন কোরে ভাগ নেয় যে, দেখে আমরা অবাক হয়ে যাই।...

পৃথিবীর অধিকাংশ অসভ্য জাতিদের মধ্যে একবিবাহ-রীতি প্রচলিত আছে। দাম্পত্য অবিশ্বস্ততা তাদের মধ্যে বিরল। কচিৎ এ রকম অপরাধ ঘট্‌লে দোষী স্ত্রী ও পুরুষ উভয়কেই গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ কঠোর শাস্তি প্রদান করে। তবে কয়েকটি আদিম জাতিদের সমাজে বিশেষ বিশেষ পর্বোপলক্ষে স্ত্রীপুরুষের অবাধ মেলামেশা ও যথেচ্ছসম্ভোগের প্রথা প্রচলিত আছে। তাছাড়া কোথাও কোথাও কুমারীদের মধ্যেও

দুশ্চরিত্রতাকে খানিকটা প্রশ্রয় দেওয়া হয়। এমন কি, কোন কোন অসভ্য ও অর্ধসভ্য জাতির সমাজে কন্যারা নিজেদের রূপ বিক্রয় কোরে যে অর্থ উপার্জন করে, তার একটা মোটা অংশ ভাবী দাম্পত্য-জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করার জন্যে সঞ্চয় করতে পারে। তাতে তাদের গৌরব বাড়ে ছাড়া কমে না। কিন্তু ওরাই আবার যখন বিয়ে করে, তখন একান্ত পতিপ্রাণা হোয়ে পড়ে; বিত্তশালী লম্পটের প্রলুব্ধ দৃষ্টি তাদের কোনমতেই টলাতে পারে না। সম্প্রতি এদের মধ্যে যারা পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে এসেছে অথবা যারা প্রাচীন ধর্ম ও সমাজ পরিত্যাগ কোরে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে, তাদের মধ্যে বিবাহিত জীবনে অসন্তোষ, ব্যভিচার ও রতিজ ব্যাধির প্রকোপ ভয়াবহ হারে বিস্তারলাভ করছে।...

যাক্, এইতো গেল জীবজন্তু ও অসভ্য মানুষদের কথা। তারপর, ক্ষুদ্র কীট-পতঙ্গরাজ্যেও যদি সন্ধান করি, তাহলে আমরা দেখতে পাব যে, এদের কোন কোন জাতি দল বেঁধে থাকলেও এক এক জোড়ার মধ্যে বেশ ভাব থাকে এবং পারতপক্ষে সেই সেই জোড়ার মধ্যে দৈহিক সম্মিলন হয়। চক্ষুর অগোচর অসংখ্য আকারপ্রকারের রোগবীজাণু পৃথিবীর জলেস্থলেশূন্যে বর্তমান। এদের ভেতর "কক্কাস্" প্রভৃতি শ্রেণীর বীজাণুকে সর্বদা জোড়ায় জোড়ায় থাক্‌তে দেখা যায়।.....

তারপর, পুরুষের বীর্যের মধ্যে একপ্রকার শুক্রকীটাণু থাকে যাদের আমরা স্বাভাবিক চোখ দিয়ে দেখতে পাই না। পুরুষের একবার সহবাসে যে বীর্য নিঃসৃত হয়, তার মধ্যে কুড়ি-পঁচিশ কোটি শুক্রকীটাণু (সংক্ষেপে 'শুক্রাণু') থাক্‌তে দেখা যায়। এদের বহুলক্ষ বা বহু সহস্র শুক্রাণু জরায়ুর মধ্যে প্রবেশ কোরে, মর্‌তে মর্‌তে পড়্‌তে পড়্‌তে, কয়েক সহস্র বা কয়েক শত জরায়ুর ঊর্ধ্বদেশে উঠে, সেখান থেকে আর একটা নলের মধ্যে প্রবেশ করে। ঐ নলের মধ্যে কোথাও তারা

স্ত্রীলোকের অণ্ডাশয় (ovary) থেকে নির্গত একটি অণ্ডাণুর সন্ধান বা সাক্ষাৎ পেলে, তার দিকে ছুটে যায়। যে শুক্রাণু সকলের আগে তার মাথাটা অণ্ডাণুর নরম গায়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেয়, তারই হয় জিৎ। বাকি অণ্ডাণুরা দৌড়ুতে দৌড়ুতে অণ্ডাণুর কাছে এসে দাঁড়িয়ে যায় এবং সেইখানে হতোদ্যম হোয়ে মারা পড়ে।

একটি শুক্রাণু একটি অণ্ডাণুর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে মিলিত হোয়ে, পরে একটি নূতন জীব-জীবনের সূত্রপাত অর্থাৎ গর্ভাধানের পটভূমিকা তৈরি করে। যখন ছুটতে ছুটতে দুটি শুক্রাণু এসে সমমুহূর্তে একটি অণ্ডাণুর গাত্রের মধ্যে সবেগে প্রোথিত হয়, তখন যমজ ভ্রূণের সৃষ্টি সূচিত হয়। কিন্তু এ ঘটনা ক্বচিৎ ঘটে।...শুধু মানুষের বেলায় নয়, উচ্চতর প্রাণিমাত্রেরই বেলায় নব জীবনের উৎপত্তির মূলে একটি ক্ষুদ্রতম অণ্ডাণুর সঙ্গে একটি ক্ষুদ্রতম শুক্রাণুর মিলনের মঞ্জু ইতিহাস রয়েছে গাঁথা। সেই একের জন্য একের মিলনাবেগ, সেই একগামিতার প্রতিচ্ছবি-কণা, সেই দুই সত্তায় একাত্ম হোয়ে নবসৃষ্টির অন্ধ উন্মাদনা!

তাই আমি তোমাদের প্রত্যেককে চিরকাল উপদেশ দিয়ে আস্‌ছি, আজকের দিনেও দিচ্ছি—অগ্নি সাক্ষ্য কোরে মন্ত্র পোড়ে বা উকিল-মোল্লার সাম্‌নে কলেমা পোড়ে, কাউকে বিয়ে কর আর নাই কর, পার তো একজনকে আজীবন ভালবাস্‌বে। মানুষকে ভালবাসা একেশ্বর বা এক দেবতার আরাধনার মতোই কঠিন সাধনা। একসঙ্গে পাঁচজনকে সত্যি ভালবাসা এবং উপর্যুপরি দশজনকে ভালবাসা অসম্ভব। তাকে তো ভালবাসা বলা যায় না, নিছক পশুপ্রবৃত্তিও বলা ভুল হবে—কারণ বিচারবুদ্ধিহীন পশুপক্ষীদের অনেক জাতির মধ্যে আমরা একনিষ্ঠ প্রেম দেখতে পাই। ওকে মোহগ্রস্ত চোখের নেশা, নিছক্ উপস্থকেন্দ্রিক দৈহিক ক্ষুধা অথবা স্বার্থপর অসুস্থ মনের বিকার—যা' খুশি বল্‌তে চাও বলো, ভালবাসা বোলে মানবতার অপমান কোরো না।

—দ্বিতীয় বৈঠক—

ভালবাসার ভিত্তিমূল

পাঁচজনকে তো দূরের কথা একজনকে ভালবাসতে গেলেই দেহে ও প্রাণে বেশ কিছু শক্তির মূলধন প্রয়োজন হয়। মনে রেখো, শুধু দেহের নয়, মনেরও। শুধু দেহের হোলে জগতের প্রত্যেক পালোয়ানই আদর্শ প্রেমিক হোতো। অবশ্য এ বইতে আমি মনের শক্তি নিয়ে বেশী আলোচনা করতে চাই না। দেহে শক্তিবৃদ্ধি ও প্রেমের ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ-কৌশল নিয়ে আমি প্রধানত এ বইতে আলোচনা করব।

সার্বাঙ্গিক শক্তির আবশ্যকতা

পালোয়ানরা ও ব্যায়ামবীররা দেহে অমিত শক্তির ভাণ্ডার রাখতে পারে সত্য, শক্তিকৌশল দেখিয়ে শতসহস্র নরনারীর চিত্তাকর্ষণ করতে পারে সত্য, গুণ্ডাবদ্‌মায়েসদের সঙ্গে মারামারি কোরে নিজের ও অপরের ধন-প্রাণ-মর্যাদা রক্ষা করতে পারে সত্য, কিন্তু প্রেমিকাকে তৃপ্ত ও তুষ্ট করার জন্যে তাদের আর একদিক থেকে শক্তিমত্তার পরিচয় দিতে হয়। এই শক্তিমত্তার সঙ্গে বুদ্ধিমত্তা ও উপায়জ্ঞতার যোগ থাকা দরকার। এইখানে মনের শক্তিও কাজে আসে। দুদিক দিয়েই ভালবাসার ভিত্তিমূলকে শক্ত কোরে তৈরি করতে হয়। ভিৎ শক্ত না হোলে প্রেমের সাত-মহলা প্রাসাদ যত যত্ন কোরেই গোড়ে তোল না কেন, একটা কালবোশেখীর ঝড়ে একেবারে ধূলিসাৎ হোয়ে যাবে।

সর্বপ্রকার শক্তি ও প্রয়োগকৌশল পুরুষকে বেশী কোরে আয়ত্ত করতে হয় এইজন্যে যে, প্রেমের ব্যাপারে তাকে অগ্রণী হোতে হয়—চেষ্টাবান হোতে হয়—অধ্যবসায়ী হোতে হয়—নারীর মনোভাব বুঝে

তার রাগসঞ্চার করতে হয়—আসঙ্গ-ব্যাপারে অধিকতর সক্রিয় হোতে হয়, দৈহিক ক্ষয় ও ক্ষতি বেশী কোরে স্বীকার করতে হয়। এমন পালোয়ান্ আমাদের দেখা আছে ও জানা আছে, যারা একাদিক্রমে একশো ডন্ ও দুশো বৈঠক দিতে পারে, কিন্তু স্ত্রীসঙ্গমে দুই-এক মিনিটের মধ্যেই হাঁপিয়ে উঠে নিজেকে নিঃশেষিত কোরে ফেলে। কোন কোন ব্যায়ামবীর বিবাহের পর অস্থায়িভাবে বা স্থায়িভাবে স্ত্রীর নিকট নিজেকে একেবারে সামর্থ্যহীন বোলে প্রমাণিত কোরেছে এবং দাম্পত্য শয্যাকে বিষধর সর্পের মতো এড়িয়ে চলেছে। সুতরাং ব্যায়াম কোরে বাহু আর বুকের পেশীকে স্ফীত করলেই চলবে না, এমন কতকগুলি ব্যায়াম-পদ্ধতির অনুশীলন করতে হবে যাতে কোরে অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বল-সঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গে সম্ভোগাঙ্গও পুষ্ট দৃঢ়িষ্ট হবে—যাতে কোরে জীবনের প্রবলতম শত্রুকে নির্জিত করার সঙ্গে সঙ্গে জীবনের পরম মিত্রকে প্রসন্ন করা চলবে।

ব্যায়ামবীরদের সকলেই রতিশক্তিতে সাধারণ লোকের চেয়ে দুর্বল—একথা মনে করলে ব্যায়ামবীরদের অপমান করা হবে; আমি তা বলছি না একেবারেই। যে সকল ব্যায়ামকুশলী ব্যক্তি জীবনের অর্ধভাগ পর্যন্ত শুধু শক্তিচর্চা ও ব্রহ্মচর্যরক্ষায় নিজের তনুমন নিয়োজিত কোরে রেখেছে, স্ত্রীলোকের চিন্তা বা দৃশ্য যাদের মনে কখনো চাঞ্চল্য আনেনি, জাগ্রৎকালে স্বয়মাগত কামাবেগ যারা টুঁটি টিপে নিষ্ক্রিয় করেছে, তাদের মধ্যেই বিবাহের পর সম্ভোগদৌর্বল্য একটু বেশী ঘটতে দেখা যায়। জগতের সর্বত্র কুস্তিগীরদের মধ্যে বিশেষভাবে এই অক্ষমতা বেশী কোরে ধরা পড়ে।

সাধারণ মানুষ যারা বাল্যকাল থেকে অতিরিক্ত মাত্রায় কৃত্রিম প্রণালীতে বীর্যপাত করেনি, কোন রতিজ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়নি, লেখাপড়া ও সামাজিক সর্ববিধ কর্তব্যরক্ষার সঙ্গে নিয়মিত পরিমিত-

ভাবে ব্যায়াম কোরে আসছে, মাসে দু'তিনবার স্বপ্নদোষ হলে যারা দুশ্চিন্তায় আহারনিদ্রা ঘুচিয়ে গাদাগাদা রকমারি পেটেন্ট্ গলাধঃকরণ করেনি, যারা বিয়ের আগে স্ত্রীলোক দেখে মুগ্ধ হয়েছে, কিন্তু তার অতি-সান্নিধ্যে যাবার প্রলোভন অনায়াসে দমন কোরে এসেছে এবং যারা ত্রিশের কিছু আগে-পরেই বিয়ে করেছে মোটামুটি সুস্থ পছন্দসই একটি তরুণীকে, তাদের মধ্যে ধাতুদৌর্বল্য, ধ্বজশৈথিল্য বা রতিবিতৃষ্ণা ক্বচিৎ দেখা যায়। এরা স্ত্রীর প্রতি কায়িক কর্তব্য সম্পাদন করতে পারে সুষ্ঠু সাফল্যের সঙ্গে, এবং বার্ধক্যের প্রান্তসীমা পর্যন্ত।

এখনকার বাঙালী মেয়েরা

মেয়েদের বিয়ের বয়স বিস্ময়কর দ্রুততার সঙ্গে বেড়ে গেছে ও যাচ্ছে। শহরের ভদ্রঘরে মেয়েদের কুড়ি না পেরুলে বিয়ের ফুলই ফুটছে না। তারাও ছেলেদের মতো কামনিবৃত্তির একাধিক অনৈসর্গিক শৈলী আবিষ্কার কোরে নিয়েছে; কেউ কেউ বহির্বিবাহিক সঙ্গম কোরছে, কেউ কেউ রতিজ ব্যাধিতেও আক্রান্ত হচ্ছে। কেউ কেউ গর্ভপাত করিয়ে অথবা আলস্যবিলাসময় জীবন যাপন কোরে শরীরমন দুয়েরই দফা নিকেশ কচ্ছে। অনেক শহরবাসিনী মেয়েদের দেখ্‌ছি অকালে স্বাস্থ্য ভেঙেছে, নানারকম স্ত্রীসুলভ ব্যায়রামে ভুগ্‌ছে তারা। কারো দাঁত খারাপ, চোখ খারাপ, অম্ল, কোষ্ঠবদ্ধতা, ঋতুস্রাবের গোলমাল; কারো শরীরের বৃদ্ধি স্থগিত হোয়ে গেছে, কাউকে থাইসিসে ধরেছে বা ধর্‌র ধর্‌র কচ্ছে। কারো চোয়াল বেরিয়ে এসেছে, কারো গাল বোসে গিয়েছে, সমস্ত মুখমণ্ডলে বয়োব্রণের উপনিবেশ, সারা গায়ে ছুলি, অপুষ্ট বা লোল স্তনযুগ, বিশীর্ণ জঘন। যৌবনের যা কিছু দৈহিক বৈশিষ্ট্য ও পরিণতির প্রিয়দর্শন নিদর্শন—তা এদের অনেকের মধ্যেই অনুপস্থিত। এদের দেখে দুঃখে-বেদনায় বুক ভোরে ওঠে। এরাই আমাদের পুত্রস্থানীয়দের ভাবী গৃহিণী, অনাগত বংশধরদের অনুৎসুক জননী!

এরা সুস্থদেহে ও তুষ্টমনে গৃহিণীর কৃত্যও করতে পারবে না, জননীর কর্তব্যও সম্পাদন করতে পারবে না। এরা একটা, দুটো বা তিনটে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী হয়তো লাভ করবে, কিন্তু স্ত্রীজন্মের অনেক কিছু সাধ-আহ্লাদ-আবেগ-অনুভূতি থেকে নিজেদের বঞ্চিত করবে। আমি গ্রন্থান্তরে বলেছি যে, মেয়েদের কুড়ির আগে শুধু বিয়ে হওয়াই কাম্য নয়, একটি সন্তানের জননী হওয়াও শ্রেয়।...তারপর এইসব শহরে-শিক্ষাব্রতী মেয়েদের আমি সর্বদা উপদেশ দিই—লেখাপড়া করা, সিনেমা দেখা, গানবাজনা শেখা, সুকুমার কলা ও রাজনীতি চর্চা, ট্রাম-বাসের ভিড়ে নিরুদ্দেশ-ভ্রমণের সময়টা কিছু সংক্ষিপ্ত কোরে, সেই অবসরটুকু নানা গৃহকর্মে আত্মনিয়োগ করতে; রান্নাবান্না, বাসন মাজা, বাটনা বাটা, কুটনো কোটা, ঘর ঝাঁট্ দেওয়া, মোটা ও সূক্ষ্ম সেলাই-ফোঁড়াই করা, শুশ্রূষা, আকস্মিক বিপদে চিকিৎসা, ছেলেপুলে মানুষ করা প্রভৃতি কাজগুলো মা-খুড়ি ও পাশের বাড়ি থেকে হাতেকলমে শিখে নিতে।

জাতীয় দুর্বলতার কারণ ও নিরাকরণ

ছেলেমেয়ে দু'দলকেই বলি—গৃহকোণে একটানা আলস্য ও দিনেরাতে দেদার ঘুম এবং গৃহবহির্ভাগে অকাজের কর্মব্যস্ততা, দুটোকেই পরিহার করতে। ভারতের সীমান্তে মহাযুদ্ধের প্রারম্ভ থেকেই আমাদের জাতীয় জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকেছে চূড়ান্ত অনিয়ম, উৎখলচ্ছুতা, অর্থবৈষম্য, অবাধ্যতা, অসন্তোষ, অসাধুতা, হিংসা, অশনবসনের অপ্রতুলতা, জাল ও ভেজালের বিষ-বাষ্প। তাই আমরা খণ্ডিত দেশে সামান্য রক্তপাতে ও অসামান্য বাস্তত্যাগে স্বাধীনতা পেয়ে বিশেষ উল্লসিত হোতে পারিনি। পদে পদে দৃষ্ট ও অদৃষ্ট হস্তে দণ্ডিত ও বিড়ম্বিত হচ্ছি।

এই বহুমুখী সমস্যার সমাধান কি এবং কবে হবে—তা নিয়ে আপাতত মাথা ঘামাবার আবশ্যকতা দেখি না, কারণ আমার চেয়ে অনেক সারালো ও জোরালো মগজ ইতোমধ্যেই সমাধান-কল্পে নিয়োজিত হয়েছে।

এখন আমার ভাবনা হ'লো—এই দুঃখদুর্দৈবের মধ্যে থেকে কি কোরে তোমরা স্বাস্থ্য ও শক্তি যথাসাধ্য অক্ষুণ্ণ রাখ্‌তে পারো, দাম্পত্যজীবনে প্রবেশ কোরে কি কোরে সুখী হোতে ও কর্‌তে পারো, কি কোরে স্বাধীন-ভারতের জন্যে দুই-একটি দীর্ঘায়ুষ্মান অক্ষয় কীর্তিমান বংশধর রেখে যেতে পারো!

যারা লেখাপড়ার অবসরে রাত্রি জেগে অসার নাটকনবেল পড়ে না, ঘন ঘন বায়োস্কোপ দেখে না, নিয়মিত মুক্তবায়ুতে খেলাধুলা করে, সাঁতার কাটে, কুচ-কাওয়াজ করে, রাইফেল প্রাক্‌টিস্ করে, প্রত্যহ ৪।৫ মাইল হাঁটে, যে সব গৃহস্থের মেয়েরা সখ কোরে এক-আধদিন নয়—নিত্য শ্রমসাধ্য গৃহস্থালির কাজ করে, তারা যদি হোটেলের ও রাস্তার খোলা খাবার 'হারাম' বোলে একেবারে বর্জন করে, গৃহে অর্ধাশনে না থাকে এবং আলোবায়ুবর্জিত অস্বাস্থ্যকর জনবহুল কক্ষে বাস না করে, তাহলে তাদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে খুব নিরাশা পোষণ করতে চাই না। কিন্তু বাকি সবাইকে অনুরোধ কচ্ছি—আহারের উপাদান ও আইনকানুন বদল কর্‌তে; এই মুদ্রাস্ফীতির লজ্জাকর পরিস্থিতিতে বসন ও মনের বিলাসের পশ্চাতে কিছু খরচ কমিয়ে দেহের সুস্থতা বজায় রাখবার জন্যে কিছু বেশী ব্যয় করতে এবং নিয়মিত কিছু ব্যায়াম কর্‌তে।··· সচ্ছল-অসচ্ছল ঘরের ছেলেমেয়ে দু'দলকেই বলছি। এই গ্রন্থের মাধ্যমে অবিবাহিত ছেলেমেয়েদের কাছে পৌঁছতে পার্‌ব না বুঝে, আমি শুধু সদ্য অথবা দু'চার-বছর-পূর্বে বিবাহিত যুবকযুবতীদের কাছেই আমার পরামর্শগুলো পেশ করছি।

ব্যায়াম ও আহারের নিয়ম

দাম্পত্য সুখকে প্রগাঢ়তর, নিরবচ্ছিন্ন ও দীর্ঘস্থায়ী করবার কলা-কৌশলগুলির পরিচয় দেবার আগে তোমাদের কাছে দৈহিক শক্তির মূলধন বাড়াবার উপযোগী কতকগুলি ব্যায়ামের নির্দেশ দিতে চাই।

পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে পুরুষদের ও মেয়েদের ব্যায়ামের কথা বল্‌ব এই বৈঠকে। বিংশ শতাব্দীর বাঙালি দুর্বল ও ব্যায়ামবিমুখ বোলে বদনাম কিনেছে। দোহাই, ব্যায়ামের নাম শুনে আঁৎকিয়ে উঠো না, নাক শিঁটকিও না। খুব সহজ পদ্ধতির কয়টি ব্যায়ামের নির্দেশ দিচ্ছি; বেশী সময় খরচ হবে না।

প্রত্যেক দল সকালে ঘুম থেকে উঠেই সর্বপ্রথম এই ব্যায়ামগুলির অনুশীলন করবে। চৈত্র থেকে আশ্বিন মাস পর্যন্ত প্রতিদিন দশ-বারো মিনিট, কার্তিক থেকে ফাল্গুন পর্যন্ত পনেরো-কুড়ি মিনিটের বেশী সময় এর পেছনে ব্যয় করার দরকার নেই। প্রত্যেক দলকেই প্রতি ব্যায়ামের পর আধ থেকে এক মিনিটকাল বিশ্রাম নিতে হবে। দু'দলই এই ব্যায়ামের কতকগুলি বিছানায় শুয়ে ও কতকগুলি শয়নকক্ষের মেঝেতে অভ্যাস করবে।

এই ব্যায়ামগুলি করলে, হাঁপানি, ফুসফুসের অসুখ, হৃদিদৌর্বল্য, অম্ল, অজীর্ণ, কোষ্ঠবদ্ধতার হাত থেকে রক্ষা পাবে; এখনকার মহার্ঘ ভাতডাল, চর্চড়ি ও নামেমাত্র মাছের ঝোল খেয়েও পেশীতে শক্তির সঞ্চার অনুভব করবে; কষ্টসহিষ্ণুতা বাড়্‌বে, কর্মে নিরলস উৎসাহ পাবে এবং সর্বোপরি সম্ভোগে রুচি ও সামর্থ্য ফিরে পাবে। মেয়েরা অধিকন্তু গায়ে কিছু মাংস, কিছু চর্বি অর্জন কর্‌তে পারবে—সর্বাঙ্গে বাঁধুনি লালিত্য সৌষ্ঠব ফিরে পাবে, নানা ভঙ্গিমায় সম্ভোগানন্দ উপভোগ করতে এবং সর্বোপরি সুখপ্রসবিনী হোতে পারবে।···এর চেয়ে আর বেশী কি চাও?

আহার সম্বন্ধে বেশী কিছু বায়নাক্কা আমি করতে চাই না। গৃহে নিত্য যেমন খাওয়া যোটে, তেমনি খাবে। যদি পারত প্রত্যহ পোয়াটাক্ খাঁটি দুধ নইলে আধ ছটাক খানেক খাঁটি মাখন, সপ্তাহে একদিন (ঠাণ্ডার সময় দু' তিন দিন) মাংস ও ডিম এবং অন্তত একদিন নিরামিষ খাবে। সকালে ব্যায়ামাভ্যাসের পর প্রাতঃকৃত্য সেরে নিয়ে একমুষ্টি কল-বের্-করা (অঙ্কুরযুক্ত) ভিজে ছোলা এবং জিরের মতো

কুচনো কয়েকখণ্ড আদা ও একটুখানি ইক্ষুগুড় খেয়ো। যাদের পেট-গরমের ধাত, ভাল প্রস্রাব হয় না, মাঝে মাঝে পেট জ্বালা করে, তারা ছোলার বদলে কাঁচা মুগ ভিজোনো আর ইক্ষুগুড় খাবে। ছোলা বা মুগ প্রতিদিন সকালে একটা চায়ের পিরিচে ঠাণ্ডা জল দিয়ে ভিজোবে ও সন্ধ্যার পর বাটির জল ফেলে দিয়ে ঐগুলো পিরিচের ওপর ছড়িয়ে রেখে একটা পাৎলা ভিজে ন্যাকড়া ঢাকা দিয়ে রাখবে। এতে অঙ্কুর বেরোবার সুবিধা হয়। যারা মাখন-রুটি খাও, তারা তাই খাবে; কিন্তু গ্রীষ্মকালে ঐসঙ্গে চা খাওয়াটা পরিত্যাগ করতে পারতো ভাল হয়—তার বদলে এক কাপ গরম দুধ কিংবা ভালো পেটেণ্ট ফুড্ খেতে পার।

বাজারের খাবার. হোটেলের চপ-কাট্‌লেট্ কারিকোর্মা, রাস্তার চানাচুর, পাকড়ী, ঘুঘ্‌নিদানা, পেঁয়াজের বড়া ও অন্যান্য ভাজাভুজি কিনে খাওয়া ভীষ্মের মত প্রতিজ্ঞা কোরে বন্ধ করে দেবে। খুব ইচ্ছে হলে, কাঠখোলায়-ভাজা আস্ত চীনাবাদাম, চাল-ভাজা, মুড়ি, চিঁড়েভাজা, ছোলাভাজা, ভুট্টার খই দু'চার পয়সার কিনে খেতে পারো মাঝে মাঝে। সঙ্গতি থাকলে ঋতুর ফল মাঝে মাঝে কিছু কিনে খেও। কমলালেবু, কলা, বিলিতী বেগুন ও পালম শাকের জন্যে খরচ একটু বাড়িও।

সরষের তেলটা নিজেরা একটু দেখেশুনে কিনো। এদেশীয় ঘি ও মাখন নামে পরিচিত বড় টীনে রক্ষিত বাজার-প্রচলিত জিনিসটি একেবারে বর্জন করো; বনস্পতিকে যতটা পার দূর থেকে নতি জানিয়ো। পাড়গাঁয়ের গোয়ালারা ও গাভীরক্ষী গরিব গৃহস্থেরাও আজকাল বেপরোয়াভাবে দুধ-ঘি-মাখনে ভেজাল মিশোচ্ছে, সুতরাং বিশ্বাসো নৈব কর্তব্যং। তার চেয়ে বরং কম পরিমাণে কোটা-আঁটা দেশী ও বিদেশী মাখন ব্যবহার কোরো। শহরে গয়লাবাড়ী বা খাটাল থেকে সহস্রচক্ষু হোয়ে সুস্থ গরুর দুধ দুইয়ে আনতে পার তো দুধ খেয়ো, নইলে গয়লাকে পয়সা না দিয়ে শটি ও রামখড়ির গুঁড়ো গরম জলে মিশিয়ে নিজের মনকে চোখ ঠেরো।

সবাইকে বেলে রাখছি, বাসি ও পান্তার প্রতি লোভ ত্যাগ করো। বেশী ভাজাভুজি, সরষে-বাটা, বিচি সমেত শুকনো লঙ্কা, পিঁয়াজ, রসুন ও গরম মসলা-দেওয়া রান্না মুখরোচক হলেও পরিণামে ঘোর অপকারক। যকৃত, পাকস্থলী ও অন্ত্রের রকমারি ব্যায়রাম এদের কল্যাণে শরীরে দেখা দেয়। পেয়াজ, রসুন, কাঁকড়া, পাঙ্গাস ঢাঙ্ গঙ্গাল বান প্রভৃতি মাছ, মুর্গির ও ভেড়ার মাংস, ডিম, জাফ্রান্, জৈয়িত্রী, এলাচ প্রভৃতি পুরুষের কামোত্তেজনা আনয়নে যেমন খানিকটা সাহায্য করে, তেমনি আবার বহু ক্ষেত্রে দ্রুত-স্খলনেরও প্রেরণা যোগায়।

দিনে খাওয়ার পর অন্ততঃ আধঘণ্টা বিশ্রাম নিয়ে কাজে বেরিয়ো (অশক্ত পক্ষে নিদেন ১৫ মিনিট)। রাত্রিতে খাওয়ার পর অন্ততঃ একঘণ্টা হাল্কা কাজ, বসে' বসে' খেলা, গান-বাজনা-গল্পগাছা কোরে ও মিনিট কয়েক মুক্ত বাতাসে বেড়িয়ে তবে শোবে। রাত্রিতে এগারটার মধ্যে ঘুমুবে ও সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ওঠার চেষ্টা করবে। সুস্থ দেহীর নিত্য ৭ ঘণ্টা ঘুমই যথেষ্ট। ছুটির দিন ৮ ঘণ্টা পর্যন্ত ঘুম চলতে পারে।

পুরুষেরা ৫০-৫৫ বছর বয়স পর্যন্ত, মেয়েরা অন্তত ৪০ বছর বয়স পর্যন্ত ব্যায়াম করবে। সর্দিকাশি হলে, অসুস্থ বোধ করলে ব্যায়াম করবে না। সারারাত্র জাগরণ করলে সকালে ব্যায়াম না কোরে পারতো সন্ধ্যার সময় ব্যায়াম কোরো, নতুবা বাদ দিয়ো। মেয়েরা ঋতুস্রাবের প্রথম তিন-চার দিন, গর্ভের চতুর্থ মাস থেকে প্রসব না হওয়া পর্যন্ত এবং প্রসবের পর দু'মাস কাল ব্যায়াম অভ্যাস করবে না। ঋতুস্রাবকালে বেশী আগুনের তাপ লাগানো, পেটে বেশী ঠাণ্ডা জল লাগানো, দৌড়ঝাঁপ করা, বেশী দূর পায়ে হেঁটে বা যানবাহনে ভ্রমণ করা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্ষারে কাপড় কাচা, ঢেঁকিতে পাত দেওয়া,....এ সব বন্ধ রাখাই উচিত। গর্ভের শেষার্ধ কাল ও প্রসবের পর অন্তত দু' মাসকাল এইসব নিষেধ মেনে চলা স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যাবশ্যক জেনো।

আগেই বলেছি যে, ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েপুরুষে ব্যায়াম সুরু করবে। দু'দলই ব্যায়ামের সময় যতটা পারো দেহ অনাবৃত রেখে একটা জাঙ্গিয়ার মতো কিছু পরে নেবে। যদি আবরু নষ্ট হবার সম্ভাবনা না থাকে, তাহলে একেবারে নগ্নাবস্থায় ব্যায়াম করতো পারো।...স্মরণ রেখো ব্যায়ামের সঙ্গে সঙ্গে শ্বাস-নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হয়। যখনই একটি দফা ব্যায়ামের প্রথমভাগে ধীরে ধীরে একটি ভঙ্গী গ্রহণ করার জন্যে পেশীগুলি টান্‌টান্ করতে থাকবে, তখনি বুকের ভেতর ধীরে ধীরে সমান টানে শ্বাস নিতে থাকবে। ঐ নির্দিষ্ট ভঙ্গীতে যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ শ্বাস বন্ধ কোরে রাখবে। তারপর আবার স্বাভাবিক ভঙ্গীতে ফিরে যাবার সময় ধীরে ধীরে শ্বাস পরিত্যাগ করতে থাকবে। ধর, ভঙ্গীটি গ্রহণ করতে ১০ সেকেণ্ড সময় নিলে—দীর্ঘশ্বাস টেনে নিতেও ১০ সেকেণ্ড নেবে। ভঙ্গীটি পুরোপুরি গ্রহণ করা অবস্থায় ৪-৫ সেকেণ্ড দম বন্ধ করে থাকবে। আবার স্বাভাবিক ভঙ্গীতে ফিরে যেতে যদি ১০ সেকেণ্ড নাও, তাহলে ঐ সময়টাতে একটু একটু কোরে শ্বাস পরিত্যাগ করতে থাকবে। দমকে দমকে যেন শ্বাস নিয়ো না অর্থাৎ থেমে থেমে—ঝাঁকি মেরে; আস্তে আস্তে একটানা শ্বাস টানবে ও ছাড়বে।

প্রথমে মেয়েদের ব্যায়ামের কথা বলি। ছবি দেখে নিখুঁৎভাবে মিলিয়ে প্রত্যেক দফার ব্যায়াম রপ্ত কোরে নাও।

মেয়েদের জন্যে ব্যায়ামপ্রণালী

১ নং ব্যায়াম। একটা নীচু নরম বালিসের ওপর মাথা রেখে বিছানার ওপর চিৎ হোয়ে শোও; হাত দুটো দু'পাশে আল্‌তোভাবে ফেলে রেখে দাও; হাঁটু দুটো ভেঙে পায়ের পাতা দুটো বিছানার ওপর চেপে রাখ। এইবার দুই বাহুর সম্মুখভাগের ওপর ও আর দুই পায়ের পাতার ওপর ভর্ দিয়ে বুক-পিঠ-পেট সমেত নিতম্ব যতটা পারো ওপর

দিকে তুলে ধর। এইভাবে অন্তত ৫-৭ সেকেণ্ড থেকে আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে যাও। এইরকম একবার থেকে সুরু কোরে কালক্রমে তিনবারে কি চারবারে উঠোবে।...কখন্ শ্বাস নিতে হবে, কখন্ শ্বাস বন্ধ করতে হবে এবং কখন শ্বাস ছাড়্‌তে হবে, তা আর বুঝিয়ে দিতে হবে না নিশ্চয়?

২ নং ব্যায়াম। সটান চিৎ হোয়ে পা দুটো পাশাপাশি রেখে শোও, হাত দুটো দু'পাশে ফেলে রাখো। এইবার উরু-সমেত একখানা পা লম্বাভাবে ধীরে ধীরে তোল আর নামাও। তোলবার সময় শ্বাস নেবে, নামাবার সময় শ্বাস ফেল্‌বে। পর্যায়-ক্রমে দুখানা পা দিয়ে এই রকম অভ্যাস করবে।

৩ নং ব্যায়াম। চিৎ হোয়ে শুয়ে, প্রথম ব্যায়ামে যেমন হাঁটু দুটো ভেঙে বিছানার ওপর রেখেছিলে, সেই রকম রাখো। তারপর উরু দুটোকে আস্তে আস্তে ভেঙে, করতালু দিয়ে চেপে ধোরে পেটের ওপর যথাসাধ্য টেনে আনো। এইবার একাদিক্রমে এক-এক পায়ের হাঁটু-সমেত নিম্নাংশটা বেশ একটু জোরে লাথি-মারার মতো ওপরদিকে সোজা কোরে মেলে দাও। বার কয়েক এই রকম কোরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এস।

৪ নং ব্যায়াম। এক কা'তে শোও। নীচেকার পাখানা ধড়ের সঙ্গে সোজাসুজি সমরেখায় রেখে দাও। ওপরের পাখানা হাঁটুর কাছে ভেঙে দিয়ে, দু'হাত দিয়ে উরুটা টেনে এনে পেটের গায়ে ঠেকাবার চেষ্টা করো। আবার অন্য কাতে শুয়ে ঠিক এই রকম করো। দু'বার দু'বার চারবার করলেই যথেষ্ট।

৫ নং ব্যায়াম। উপুড় হোয়ে, হাতদুটো সোজা রেখে, করতালু আর হাঁটুর ওপর ভর্ দিয়ে মাথা-সমেত ধড়্‌টা সমান্তরালভাবে তুলে ধর। এইবার এক হাঁটুর ওপর্ ভর্ দিয়ে আর একখানা পা সোজাসুজি শূন্যে মেলে দাও। ক্রমান্বয়ে দুই পা দিয়ে এইরকম বার কয়েক কর। ব্যস্।

৬ নং ব্যায়াম। যারা একটু উঁচু তক্তাপোষ বা পালঙ্কের ওপর

শোয়, কেবল তাদের জন্যে এই ব্যায়াম। বালিশ থেকে মাথা নামিয়ে, চিৎ হোয়ে খাটের এক দিকের লম্বা প্রান্তের দিকে সরে এসো। কোমরের নিম্নপ্রান্ত পর্যন্ত দেহের ঊর্ধ্বাংশটা বিছানার ওপর রেখে, নিম্নাংশটা খাটের নীচের দিকে অর্ধচন্দ্রাকারে ঝুলিয়ে দাও। হাত দুটো উড়ো জাহাজের ডানার মতো দু'পাশে মেলে দাও; সোজাসুজি নিষ্পলক নেত্রে ছাতের দিকে চেয়ে থাকো। পাদুটো পর্যায়ক্রমে যথাসাধ্য ওঠাও আর নামাও। এইভাবে ২।৩ মিনিট কোরে পালঙ্কের ওপর উঠে শোও।

৭ নং ব্যায়াম। উপুড় হোয়ে শুয়ে, হাত দু'খানা ও হাঁটু দুটো ভেঙে প্রণাম করার মতো ভঙ্গী গ্রহণ করতে থাকো। পিঠ্‌টা ধনুকের মতো গুটিয়ে, কনুই দুটো আর হাঁটু দুটো যথাসাধ্য পরস্পরের কাছে আন্‌বার চেষ্টা করো। আবার স্বাভাবিক (উপুড় হওয়া) অবস্থায় ফিরে যাও। এইরকম একবার থেকে সুরু করে সইয়ে সইয়ে তিনবারে উঠো।

৮ নং ব্যায়াম। চিৎ হোয়ে শোও। পা দুটো পাশাপাশি রেখে টান্ টান্ কোরে মেলা থাক্‌বে এবং গোড়ালি দুটো বেশ শক্ত কোরে বিছানার (বা মেঝের) ওপর সংলগ্ন রাখবে। প্রসারিত করপত্র-সমেত হাত দুটো মাথার দু'পাশ দিয়ে সোজাসুজি পাতিয়ে রেখে দেবে। তারপর ধীরে ধীরে মুখমণ্ডল সমেত দেহকাণ্ডটি উত্তোলন কোরে উপবেশন করবে; হাত দু'খানাও সঙ্গে সঙ্গে ঊর্ধ্বে তোলা চাই। এইবার পিঠটা ধনুকের মতো বেঁকিয়ে দুই হাতের করাঙ্গুলি দিয়ে পায়ের আঙুলগুলো স্পর্শ করার চেষ্টা করো। দেখো এইভাবে পদাঙ্গুলি স্পর্শ করতে গিয়ে হাঁটুর কাছে পাদুটো বেঁকিয়ে ফেলো না।...একবার থেকে বাড়িয়ে বাড়িয়ে কালক্রমে চার-পাঁচবার পর্যন্ত উঠতে পারো।

৯ নং ব্যায়াম। মাথার দু'পাশে হাত দুখানা তুলে ধর। আঙুল সমেত করপত্র দু'খানি সাম্‌নে মেলা থাকবে এবং দুই হাতের দুই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের পরস্পরের মধ্যে ৪।৫ ইঞ্চি ফাঁক থাকবে। হাত দু'খানা এই

অবস্থায় রেখে, মাথা সমেত দেহকাণ্ডকে কোমরের কাছ থেকে দুম্‌ড়ে ভেঙে দাও। হাত দু'খানা ঘুরে মাটির দিকে নাম্‌বে এবং আঙুলগুলো পায়ের পাতার সম্মুখের মাটি স্পর্শ করবে। আবার বিপরীতমুখী হোয়ে পূর্বাবস্থায় ফিরে এসো। যখন হাতদু'খানা মাথার ওপর তুলে দেহকাণ্ড সোজা করবে, তখন গভীর শ্বাস টানবে। ৪।৫ সেকেণ্ড শ্বাস ধোরে রেখে, দেহকাণ্ডটিকে নিম্নাভিমুখী করবার সময় শ্বাস ধীর-গতিতে ছাড়তে থাক্‌বে। প্রত্যহ একবার থেকে সুরু কোরে শেষ পর্যন্ত ৫।৬ বারে উঠ্‌বে।

১০ নং ব্যায়াম। পা দু'খানা পাশাপাশি রেখে সোজা হোয়ে দাঁড়াও। হাত দুখানা কাঁধের সোজাসুজি দু'দিকে মেলে দাও। হাতের পাতা ওপরদিকে মেলা থাক্‌বে। এইবার একই সময়ে হাতদুটো কনুইয়ের কাছে ভেঙে আঙুলগুলো কাঁধের ওপর দিয়ে গলার মূলদেশ স্পর্শ করাও। তারপর হাত দুখানি সোজাসুজি কানের পাশ দিয়ে একেবারে মাথার ওপর দিকে তুলে ধর; দুই হাতের আঙুলগুলি পরস্পর পরস্পরকে যেন স্পর্শ করে। এই অবস্থা থেকে প্রথম অবস্থায় ফিরে এস। ৩ বার থেকে সুরু কোরে বাড়াতে বাড়াতে ৮।১০ বারে এসে পৌঁছবে।

পুরুষদের জন্যে ব্যায়ামপ্রণালী

এইবার পুরুষদের ব্যায়াম আরম্ভ করছি। শোয়ার ব্যায়ামগুলি বেছে নিয়ে, সেগুলি বিছানার ওপর শুয়ে আগে কোরে নিতে পারো।

১ নং ব্যায়াম। সোজা হয়ে পায়ের পাতা দু'খানা পাশাপাশি রেখে দাঁড়াও। শ্বাস টেনে নিতে নিতে একখানা হাঁটু দুম্‌ড়ে মাটি থেকে তুলে দু'হাত দিয়ে চেপে পেটের ওপর ঠেসে ধর। সেকেণ্ড পাঁচেক এইভাবে ধোরে থেকে ও শ্বাস বন্ধ রেখে, তারপর শ্বাস ত্যাগ করতে করতে পাখানা মাটিতে নামিয়ে দাও। আবার অন্য পাখানা নিয়ে ঠিক এই

রকম কর। যাদের পেটে ভুঁড়ি হচ্ছে, তারা এই ব্যায়াম করলে উপকার পাবে। ভুঁড়ি হ'ল সম্ভোগের একটা জাঁদরেল দুষমন্। এই রকম ৪ বার থেকে সইয়ে সইয়ে ৮।১০ বার পর্যন্ত ওঠো।

২ নং ব্যায়াম। হাত দু'খানা প্রজাপতির ডানার মতো দু'পাশে মেলে দিয়ে, পায়ের পাতা দুটো একটু ফাঁক কোরে এবং পায়ের গোড়ালি দুটো গায়ে-গায়ে লাগিয়ে ও একটু তুলে সোজা হয়ে দাঁড়াও। এইবার হাত দু'খানা সাম্‌নের দিকে এনে জড়ো করতে থাকো এবং ঐ সঙ্গে আধ-বসার মতো ভঙ্গী নিয়ে ফুট-খানেক ডিঙ্গি মেরে সাম্‌নের দিকে লাফিয়ে এস। আবার এইভাবে লাফিয়ে পিছিয়ে গিয়ে হাঁটু সোজা কর এবং হাত দু'খানা দুপাশে মেলে দাও। এইরকম ৩ বার থেকে আরম্ভ কোরে একটু একটু কোরে ১২ বার পর্যন্ত উঠ্‌তে পারো।

৩ নং ব্যায়াম। বিছানায় বা মাটির ওপর চিৎ হয়ে শোও। তারপর ধীরে ধীরে শ্বাস টান্‌তে টান্‌তে ঠিক ছবির মত হাঁটু ভেঙে মাথা আর পায়ের পাতার ওপর ভর দিয়ে সমস্ত দেহটাকে খিলানের মতো শূন্যে তুলে ধরো। শ্বাস বন্ধ রেখে আধ মিনিট খানেক (সইয়ে সইয়ে ১॥ মিনিট পর্যন্ত) এইভাবে থাক। তারপর শ্বাস ফেলতে ফেলতে ধীরে ধীরে বিছানার ওপর সটান শুয়ে পড়। এই ব্যায়াম একবার করলেই যথেষ্ট।

৪ নং ব্যায়াম। সোজা হোয়ে দাঁড়িয়ে হাত দু'খানাকে দু'পাশে ছড়িয়ে মেলে দিয়ে অর্ধচন্দ্রাকারে যতটা পারো পিঠের দিকে ঠেলে দাও। এইবার এক পায়ের হাঁটু সামান্য একটু ভেঙে এবং তার ওপর দেহের সমস্ত ভার চাপিয়ে আর একখানা পা পেছন দিকে সোজাসুজি মেলে দাও। এই রকমভাবে আধ মিনিট থেকে এক মিনিট খানেক শ্বাসবন্ধ রেখে দাঁড়িয়ে থাকবার চেষ্টা করো,—অনেকটা যেন এক-ঠেঙা বক্ ডানা মেলে উড়্‌তে চাইছে।

৫নং ব্যায়াম। চিৎ হোয়ে শুয়ে পড়ো; দু'খানা হাত ধড়ের

দু'পাশে সোজাসুজি রেখে দাও। এইবার দুই হাতের ওপর ভর দিয়ে শ্বাস নিতে নিতে পাছা থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত শরীরের নিম্নাংশ দুম্‌ড়ে বুকের ওপর দিয়ে নিয়ে যাও। উল্টানো

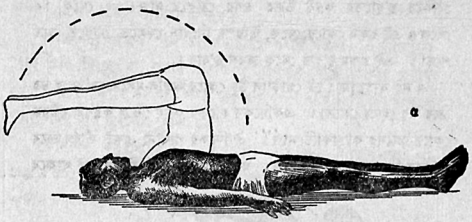

পা দুখানা সোজাসুজি মাথার কয়েক ইঞ্চি ওপর দিয়ে চলে যাবে। সইয়ে সইয়ে আধ থেকে এক মিনিট পর্যন্ত এইরকম অবস্থায় থাক্‌তে অভ্যাস কর; তখন দম বন্ধ কোরে রেখে দেবে। তারপর শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে ধীরে ধীরে পূর্বাবস্থায় ফিরে এস। একবার করলেই যথেষ্ট।

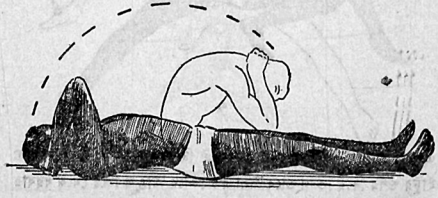

৬ নং ব্যায়াম। চিৎ হোয়ে শুয়ে পড়ো। গোড়ালি দুটো মেঝের সঙ্গে শক্ত কোরে লাগিয়ে রাখো, হাত দু'খানা কনুয়ের কাছে ভেঙে ও

মাটি থেকে একটু তুলে দু'হাতের আঙুলগুলো পরস্পর গ্রথিত কোরে কাঁধের নীচে রাখ। নিঃশ্বাস টান্‌তে টান্‌তে উঠে বোসো, হাত যেমন আছে তেমনি থাক্‌বে। এখন দম বন্ধ কোরে পিঠটাকে ধনুকের মতো বেঁকিয়ে দু'হাতের কনুই উরুর ওপর ঠেকিয়ে দাও। ৫ থেকে ১০ সেকেণ্ড এই রকম কোরে থেকে, তারপর নিঃশ্বাস ফেল্‌তে ফেল্‌তে শুয়ে পড়ো। এই রকম দু'বার থেকে ক্রমশ ছ'বার।

৭ নং ব্যায়াম। দুই গোড়ালি উঁচু কোরে অঙ্গুলি-মূলদেশের ওপর ভর্ দিয়ে উবু হোয়ে বোসো। একদিকের হাতের কনুই ভেঙে করপত্র মুষ্টিবদ্ধ কোরে বগলের কাছাকাছি নাও। ঐ দিকের পাখানা একটু তীর্যগ্‌ভাবে বাইরের দিকে খাড়া মেলে দাও। অন্যদিকের পায়ের হাঁটু ভাঙাই থাকবে

৭

এবং গোড়ালি উঁচুই থাক্‌বে। কেবল ঐ দিকে মুখখানা ঘুরিয়ে হাতখানা হাঁটুর ওপর দিয়ে তির্যগ্‌ভাবে প্রসারিত কোরে আঙুল দিয়ে মেঝে ধরবার চেষ্টা করো। আবার পা বদ্‌লিয়ে এইরকম ভঙ্গী গ্রহণ করো। দু'বার থেকে কালক্রমে ছ'বার পর্যন্ত—তাহোলেই যথেষ্ট।

৮ নং ব্যায়াম। মেয়েদের ৩ নং ব্যায়ামের অনুরূপ অভ্যাস করো। চারবার থেকে দশ বার বেশ তাড়াতাড়ি করবে।

৯ নং ব্যায়াম। মেয়েদের ৯ নং ব্যায়ামের অনুরূপ অভ্যাস করো। দু'বার থেকে বাড়াতে বাড়াতে ছ'বার।

১০ নং ব্যায়াম। ডন্ করতে তোমরা সবাই জানো। এ ব্যায়ামের আর ছবি দিলুম না, করার কৌশলও লিখ্‌লুম না। প্রত্যহ ৩ বার থেকে আরম্ভ কোরে ১২ বার পর্যন্ত ডন্ করবে। সময় ও সামর্থ্য থাকলে ১৫।২০।২৫ বার করলেও দোষ নেই।

কোনদিন কর্মব্যস্ততা বা আলস্যবশত যদি সব ব্যায়ামগুলো না করতে চাও, অন্তত ডন্ ও বৈঠক আর শোয়া ব্যায়ামগুলোর যে-কোন একটা করতে যেন গাফিলতি না হয়।

তৃতীয় বৈঠক

সোহাগের আদি—আলিঙ্গন ও চুম্বন

বিয়ের পর কিভাবে পতিপত্নী পরস্পরের সন্নিকটে আসবে এবং এসে কিভাবে তারা ধাপে ধাপে দৈহিক মিলনের সৌধশীর্ষের দিকে উঠ্‌তে থাকবে—তার বিশদ বিবরণ ও খুঁটিনাটি উপদেশ আমাদের দেশের প্রাচীন কামতাত্ত্বিকগণ দিয়ে গেছেন। এবিষয়ে আধুনিক পাশ্চাত্ত্য বিশারদরা অবশ্য পশ্চাৎপদ নন্। অনেক ভালো ভালো বইয়ে তাঁরা নবদম্পতিকে প্রচুর সুপরামর্শ ও নূতন জীবন সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত তথ্য পরিবেষণ করেছেন। আমারও কয়েকখানি বইয়ে—বিশেষভাবে "ওগো বর ওগো বধূ" ও "নরনারীর যৌনবোধ" নামক বই দু'খানায় এ বিষয়ে বহু ব্যবহারিক জ্ঞান আহরণ কোরে দিয়েছি।

একই বিয়ের দুই পর্ব

শুধু সভ্য ও অর্ধসভ্য সমাজে নয়, অসভ্য বর্বর জাতিদের সমাজেও অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রকন্যার বিবাহ-দান ব্যাপারটাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় না। যদিও কোথাও কোন আদিম জাতির সমাজে এ প্রথা থেকে থাকে, তথাপি বিয়ের পরই তাদের দৈহিক মিলন-সাধনের সুবিধা কুত্রাপি অভিভাবক-অভিভাবিকা ও সমাজপতিরা দেন না। কোন কোন সমাজে কিশোর-বয়স্ক স্বামী ও অরজস্কা বধূকে দিনে কিংবা রাতে দেখাসাক্ষাতের সুযোগ মোটেই দেওয়া হয় না। আগে আমাদের দেশে যখন অপ্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে বিবাহবিধি প্রচলিত ছিল, তখন স্ত্রী রজোদর্শন না করা পর্যন্ত বাপের বাড়িতে থাকত। সেইখানে অর্থাৎ স্বামীর শ্বশুরালয়ে প্রথম-রজোদর্শনের একটা উৎসব হ'ত এবং সেই উৎসবে যোগদানের জন্য স্বামীকে নিমন্ত্রিত করা হ'ত।

সেই উৎসবের নাম ছিল 'পুষ্পোৎসব'। বিয়ের পর প্রথম ঋতুদর্শনের নাম ছিল 'ফল দেখা' বা "দ্বিতীয় বিয়ে"। দ্বিতীয় বিয়ে মানে—একই লোকের দ্বিতীয়বার বিয়ে নয়; ওর মানে—একই বিয়ের দ্বিতীয় পর্ব। ওইটাই ছিল সত্যিকারের বিয়ে; কারণ ঐ সময় প্রথম-ঋতু-স্নানের পর স্ত্রী প্রথম-স্বামিসঙ্গ লাভ কর্‌ত এবং বিয়ের আদিম ও প্রধান উদ্দেশ্যকে সফলতার পথে দাঁড় করাতে পার্‌ত।

বিহারে ও যুক্তপ্রদেশে বাংলাদেশের চেয়েও বেশী মাত্রায় বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল, এখনো অশিক্ষিতদের মধ্যে রীতিমতো চালু রয়েছে। ওদের দেশে দ্বিতীয় বিয়ের নাম "গওনা"। গওনাতে যদি স্বামী এসে যোগ না দেয় এবং তার স্ত্রীর সঙ্গে একত্র রাত্রিবাস না করে, তাহলে বধূর অভিভাবকগণ এই ব্যাপারকে গুরুতর কর্তব্যচ্যুতি বোলে মনে করে। ইচ্ছে কর্লে তারা বউকে আর শ্বশুরবাড়ি না পাঠাতে ও প্রথম বিয়ে ভেঙে দিয়ে অন্যত্র বিয়ে দিতে পারে।...

মেয়েদের পুরুষসংসর্গের বৈধ বয়স

আমি গ্রন্থান্তরে বলেছি এবং এ বইতেও বলছি যে, মেয়েরা ঋতু-দর্শন কর্লেই যে তারা দেহমনে পরিপক্ক হল—এরূপ মনে করা মস্ত ভুল। অবশ্য সাধারণত ঋতুশোণিত দেখা দেবার অব্যবহিত পরে পুরুষ-সঙ্গ করলেই মেয়েরা গর্ভবতী হোতে পারে এবং অনেক ক্ষেত্রে হয়ও। বারো সাড়ে-বারো বছরে আমাদের দেশের অনেক মেয়েই আদ্যঋতু দর্শন করে; ঐ সময়ের ঠিক পরেই পুরুষ-সংসর্গে তারা গর্ভিণী হোতে এবং তার দশ মাস পরেই মাতৃত্বের অধিকারিণী হোতে পারে। কিন্তু তাই বোলে তারা যে দেহে ও মনে মা হবার উপযুক্ত হোল—একথা কোন সুবিবেচক ব্যক্তিই বলবে না। আমাদের শাস্ত্রকাররা কেউ কেউ (বসিষ্ঠ, গর্গ প্রভৃতি) অনুশাসন দিয়েছেন যে, প্রথম ঋতুদর্শনের

অন্তত তিন বছর পরে মেয়েরা পুরুষসংসর্গের ও মাতৃত্ব-লাভের উপযুক্ত হয়। চরক, সুশ্রুত প্রভৃতি প্রাচীন আয়ুর্বেদজ্ঞ ঋষিরাও ষোলোর আগে মেয়েদের গর্ভধারণ করা ঘোর আপত্তিকর ও অকল্যাণজনক বোলে মত প্রকাশ কোরে গিয়েছেন। মধ্যযুগে আমরা এই সব সনাতন স্বাস্থ্যসম্মত রীতিনীতিগুলিকে ছিঁড়ে-কুটে ঝড়ের মুখে উড়িয়ে দিয়েছিলুম। এ বিষয়ে আমি অন্যান্য বইতে চুলচেরা বিচারালোচনা কোরে আমার মীমাংসা ও অভিমত লিপিবদ্ধ করেছি।

যাই হোক, আজকাল আমাদের দেশের শিক্ষিত পরিবারের মেয়েদের পল্লীগ্রামে ষোলো থেকে কুড়ির মধ্যে এবং শহরে কুড়ি থেকে চব্বিশ-পঁচিশের মধ্যে সচরাচর বিয়ে হোতে দেখ্‌ছি। সুতরাং বাল্য বিয়ের মধ্য দিয়ে অকালে পুরুষসংসর্গ করা ও জননী হওয়ার সম্ভাবনা তাদের নেই। কিন্তু অন্য দিকে আবার অবৈধ সংসর্গ করার ও গর্ভিণী হওয়ার সম্ভাবনা ওদের মধ্যে রীতিমতো বেড়ে গিয়েছে, প্রতিদিন আরো বেড়ে যাচ্ছে।... কিন্তু সে সমস্যা নিয়ে আলোচনা এ বইয়ে আমি কর্‌ব না। এতে আমি শুধু বল্‌ব বৈধভাবে পুরুষ-সংসর্গ কর্তে যে সব ক্রিয়াকলাপ ও কায়দা-কানুনের আবশ্যক হয়, সেইগুলোর কথা।

বাৎস্যায়ন তাঁর "কামসূত্রে"র এক জায়গায় প্রসঙ্গক্রমে 'বিস্রম্ভন' ও 'উপচার' শব্দ দুটি ব্যবহার কোরেছেন। বিস্রম্ভন মানে—কাউকে নিজের মনের পরিচয় দিয়ে ও তার বিশ্বাস জন্মিয়ে তাকে প্রণয়োন্মুখ কোরে তোলা। উপচার মানে—সঙ্গমপ্রারম্ভে প্রণয়ী বা প্রণয়িনীর দেহের কামজ কেন্দ্রগুলিকে নানাপ্রকার পদ্ধতিতে উদ্দীপিত করা। এই দুটি কথাই মনে রেখো।...বিয়ের পর বিস্রম্ভন মেয়েদের প্রতিই করতে হয়; কারণ তারা সাধারণত পুরুষদের চেয়ে হয় বেশী লজ্জাবতী, শকাংকুলা, অল্পবয়স্কা, কামের ব্যবহারিক দিকটায় অধিকতর অনভিজ্ঞা ও কণ্ঠোদ্দীপন-শীলা। বহু দেশেই ও বহু ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে নববধূকে বিয়ে কোরে

এনেই তার বিশ্বাস না জন্মিয়ে এবং তার সম্মতি না নিয়ে স্বামীর অভিগমন-চেষ্টাকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। বহু অসভ্য জাতিদের মধ্যে নিয়ম আছে, বিয়ের পর তৃতীয় রাত্রিতে স্বামী তার প্রাপ্তবয়স্কা স্ত্রীকে সাবধানে উপভোগ করতে পার্‌বে।

হজরৎ মোহাম্মদ প্রাপ্তবয়স্কা মেয়েদের বিয়ে দিতে এবং সম্ভব হলে বিয়ের আগে তাদের দিয়ে পাত্রকে একবার দেখিয়ে নিতে অনুজ্ঞা দিয়ে গেছেন। কোন কোন হাদিশে এ সম্বন্ধে খুব উদার মত প্রচার করা হয়েছে। আরবে মেয়েরা সাধারণত ১০।১১ বছরের পূর্বেই ঋতুদর্শন করে। কিন্তু প্রমাণ পাওয়া যায়, হজরৎ মোহাম্মদের সময় বাল্যবিবাহের রেওয়াজ থাকলেও অনেক মেয়েকে তেরো-চোদ্দোর আগে বিয়েই দেওয়া হোত না। ক্বচিৎ দেওয়া হলেও এই বয়সের আগে স্বামি-সম্মিলনের সুবিধা দেওয়া হোত না। পারস্যে চিরকালই মেয়েরা রীতিমতো সেয়ানা না হলে বিয়ের উপযুক্ত বোলে গ্রাহ্য হোত না।...ভারতবর্ষীয় বহু প্রদেশের মুসলমান-সমাজে 'চৌঠারি' বোলে একটা পর্ব বিয়ের চতুর্থ দিনে অনুষ্ঠিত হয়—অনেকটা হিন্দুদের ফুলশয্যার মতো উৎসব। ঐদিনের রজনীতে স্বামিস্ত্রীর প্রথম সম্মিলন সংঘটিত হয়।...এসব কথা তোমরা আমার অন্যান্য বই থেকে বোধহয় জানতে পেরেছ।

মেয়েরা কোন্ বয়সে রতিরসজ্ঞা হয়

যাই হোক্, আমার মতে, আমাদের দেশে খুব পাকা ও বাড়ন্ত মেয়ে হলে চোদ্দ এবং সাধারণ মেয়ে হলে ষোলোর আগে বিয়ে কি জিনিস, স্বামী কি পদার্থ—তা ভালো কোরে বুঝতে পারে না এবং সহবাসের পূর্ণ রসাস্বাদ গ্রহণ করতে পারে না। যে সব মেয়ে সহবাস ব্যাপারটা দেহ দিয়ে সইতে পারে এবং তাতে খুব আপত্তি করে না, মনে কোরো না—সেটাকে তারা মনে-প্রাণে গ্রহণ করে এবং তার থেকে পূর্ণ আনন্দ-

অন্তত তিন বছর পরে মেয়েরা পুরুষসংসর্গের ও মাতৃত্ব-লাভের উপযুক্ত হয়। চরক, সুশ্রুত প্রভৃতি প্রাচীন আয়ুর্বেদজ্ঞ ঋষিরাও ষোলোর আগে মেয়েদের গর্ভধারণ করা ঘোর আপত্তিকর ও অকল্যাণজনক বোলে মত প্রকাশ কোরে গিয়েছেন। মধ্যযুগে আমরা এই সব সনাতন স্বাস্থ্যসম্মত রীতিনীতিগুলিকে ছিঁড়ে-কুটে ঝড়ের মুখে উড়িয়ে দিয়েছিলুম। এ বিষয়ে আমি অন্যান্য বইতে চুলচেরা বিচারালোচনা কোরে আমার মীমাংসা ও অভিমত লিপিবদ্ধ করেছি।

যাই হোক, আজকাল আমাদের দেশের শিক্ষিত পরিবারের মেয়েদের পল্লীগ্রামে ষোলো থেকে কুড়ির মধ্যে এবং শহরে কুড়ি থেকে চব্বিশ-পঁচিশের মধ্যে সচরাচর বিয়ে হোতে দেখ্‌ছি। সুতরাং বাল্য বিয়ের মধ্য দিয়ে অকালে পুরুষসংসর্গ করা ও জননী হওয়ার সম্ভাবনা তাদের নেই। কিন্তু অন্য দিকে আবার অবৈধ সংসর্গ করার ও গর্ভিণী হওয়ার সম্ভাবনা ওদের মধ্যে রীতিমতো বেড়ে গিয়েছে, প্রতিদিন আরো বেড়ে যাচ্ছে।... কিন্তু সে সমস্যা নিয়ে আলোচনা এ বইয়ে আমি করব না। এতে আমি শুধু বল্‌ব বৈধভাবে পুরুষ-সংসর্গ কর্তে যে সব ক্রিয়াকলাপ ও কায়দা-কানুনের আবশ্যক হয়, সেইগুলোর কথা।

বাৎস্যায়ন তাঁর "কামসূত্রে"র এক জায়গায় প্রসঙ্গক্রমে 'বিস্রম্ভন' ও 'উপচার' শব্দ দুটি ব্যবহার কোরেছেন। বিস্রম্ভন মানে—কাউকে নিজের মনের পরিচয় দিয়ে ও তার বিশ্বাস জন্মিয়ে তাকে প্রণয়োন্মুখ কোরে তোলা। উপচার মানে—সঙ্গমপ্রারম্ভে প্রণয়ী বা প্রণয়িনীর দেহের কামজ কেন্দ্রগুলিকে নানাপ্রকার পদ্ধতিতে উদ্দীপিত করা। এই দুটি কথাই মনে রেখো।...বিয়ের পর বিস্রম্ভন মেয়েদের প্রতিই করতে হয়; কারণ তারা সাধারণত পুরুষদের চেয়ে হয় বেশী লজ্জাবতী, শকাংকুলা, অল্পবয়স্কা, কামের ব্যবহারিক দিকটায় অধিকতর অনভিজ্ঞা ও কষ্টোদ্দীপন-শীলা। বহু দেশেই ও বহু ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে নববধূকে বিয়ে কোরে

এনেই তার বিশ্বাস না জন্মিয়ে এবং তার সম্মতি না নিয়ে স্বামীর অভিগমন-চেষ্টাকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। বহু অসভ্য জাতিদের মধ্যে নিয়ম আছে, বিয়ের পর তৃতীয় রাত্রিতে স্বামী তার প্রাপ্তবয়স্কা স্ত্রীকে সাবধানে উপভোগ কর্‌তে পার্‌বে।

হজরৎ মোহাম্মদ প্রাপ্তবয়স্কা মেয়েদের বিয়ে দিতে এবং সম্ভব হলে বিয়ের আগে তাদের দিয়ে পাত্রকে একবার দেখিয়ে নিতে অনুজ্ঞা দিয়ে গেছেন। কোন কোন হাদিশে এ সম্বন্ধে খুব উদার মত প্রচার করা হয়েছে। আরবে মেয়েরা সাধারণত ১০।১১ বছরের পূর্বেই ঋতুদর্শন করে। কিন্তু প্রমাণ পাওয়া যায়, হজরৎ মোহাম্মদের সময় বাল্যবিবাহের রেওয়াজ থাকলেও অনেক মেয়েকে তেরো-চোদ্দোর আগে বিয়েই দেওয়া হোত না। ক্বচিৎ দেওয়া হলেও এই বয়সের আগে স্বামি-সম্মিলনের সুবিধা দেওয়া হোত না। পারস্যে চিরকালই মেয়েরা রীতিমতো সেয়ানা না হলে বিয়ের উপযুক্ত বোলে গ্রাহ্য হোত না।...ভারতবর্ষীয় বহু প্রদেশের মুসলমান-সমাজে 'চৌঠারি' বোলে একটা পর্ব বিয়ের চতুর্থ দিনে অনুষ্ঠিত হয়—অনেকটা হিন্দুদের ফুলশয্যার মতো উৎসব। ঐদিনের রজনীতে স্বামিস্ত্রীর প্রথম সম্মিলন সংঘটিত হয়।...এসব কথা তোমরা আমার অন্যান্য বই থেকে বোধহয় জানতে পেরেছ।

মেয়েরা কোন্ বয়সে রতিরসজ্ঞা হয়

যাই হোক্, আমার মতে, আমাদের দেশে খুব পাকা ও বাড়ন্ত মেয়ে হলে চোদ্দ এবং সাধারণ মেয়ে হলে ষোলোর আগে বিয়ে কি জিনিস, স্বামী কি পদার্থ—তা ভালো কোরে বুঝতে পারে না এবং সহবাসের পূর্ণ রসাস্বাদ গ্রহণ করতে পারে না। যে সব মেয়ে সহবাস ব্যাপারটা দেহ দিয়ে সইতে পারে এবং তাতে খুব আপত্তি করে না, মনে কোরো না—সেটাকে তারা মনে-প্রাণে গ্রহণ করে এবং তার থেকে পূর্ণ আনন্দ-

অনুভূতি লাভ করে। সাধারণত চোদ্দ থেকে একটু একটু কোরে হোতে হোতে অনেক মেয়ে ষোলো-সতেরো-আঠারো বছর বয়সে ষোলো আনা রতিরসজ্ঞা হয়।

অবশ্য কিছুদিন আগে পর্যন্ত এমন অনেক মেয়ে দেখা যেত, এখনো কিছু কিছু দেখা যায়—বিশেষভাবে পল্লীগ্রামে, যারা দশ-এগার-বারো বছর বয়স থেকেই বাইরের কোন প্রভাবের আওতায় না এসেও আন্তঃপ্রেরণার বশে পুরুষের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শের জন্য লালায়িত হ'ত বা হয়।

আবার যারা সদ্‌ভাবে সংযমের মধ্য দিয়ে কৌমার্য যাপন কোরে যৌবনে অর্থাৎ সতোরো-আঠারো-উনিশ-কুড়িতে বিয়ে করে, তারা যে বিয়ের পরদিনই প্রথম স্বামি-সঙ্গমে পুরোপুরি সুখোপলব্ধি করার সামর্থ্য অর্জন কর্‌ল, এটাও মনে করা ঠিক হবে না। তার দেহ তৈরি থাকে বটে, কিন্তু মন তৈরি হোতে তাদেরও কিছুদিন সময় লাগে। তাছাড়া, অরমিতা কুমারীর যৌবনপ্রারম্ভে বা যৌবন-শেষে, যখনি বিয়ে হোক্ না কেন, প্রথম সংসর্গের বেদনা অল্পবিস্তর তাকে সইতে হবেই।

কৈশোরে বা যৌবনে যে সব মেয়েদের বিবাহ হয়েছে তাদের কাউকে কাউকে জিজ্ঞাসা কোরে জানতে পারা গেছে যে, তারা কেউ কেউ বিয়ের ছ'মাস, এক বছর বা দু'বছর বাদে রমণে পূর্ণানন্দ অনুভব করতে পেরেছে, কেউ কেউ একটি অথবা দুটি ছেলেপুলে হবার পর। আবার কেউ কেউ এমন আছে যারা চিরকালই স্বামিসঙ্গমে আংশিক আনন্দ পায়, কেউ আবার মোটেই পায় না। এক-একজন আবার রীতিমত বিরক্তিবোধ করে চিরকালই এবং পারতপক্ষে আসঙ্গ এড়িয়ে চলে।

স্ত্রীর অসুখী হওয়ার কারণাবলী

দেহগত সমস্ত অনুভূতির কর্তা তো মন। সেই মন আগে স্বামিকে ভালবাসতে শিখ্‌বে, তবে তো তার আসঙ্গ ওর ভাল লাগবে। স্বামি-

স্ত্রীতে বনিবনাও হওয়া, পরস্পরের মধ্যে মনের ও মতের মিল হওয়া বড় সোজা ব্যাপার নয়। তার ওপর স্বামীর প্রথম রাত্রির ব্যবহার অনেক স্ত্রীরই ভবিষ্যৎ দাম্পত্য জীবনের পটভূমিকা তৈরি করে। অনেক স্ত্রীকেই দেখেছি, যে কারণেই হোক্ স্বামী পছন্দ হয়নি, তার সঙ্গে অনেক বিষয়েই মিল খুঁজে পায় নি, অথচ মোটামুটি শান্তিতে তাদের ঘরসংসার কচ্ছে, নিয়মিত তার শয্যাসঙ্গিনী হচ্ছে এবং তার ছেলেপুলে মানুষ কচ্ছে। খাওয়া-পরার কষ্ট না থাক্‌লে এবং স্বামীর দুর্ব্যবহার একেবারে অসহ্য না হলে, তারা বিদ্রোহ করে না, খুব বেশী ঝগড়াঝাঁটি বা কান্নাকাটি করে না। তবে কেউ কেউ অবশ্য প্রৌঢ়কালে বা বৃদ্ধবয়সে বিদ্রোহ করে।

অসুখী ও স্বামিবিদ্বেষিণী বউ অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশেও লক্ষ লক্ষ আছে; বিবাহবিচ্ছেদের সুবিধা থাক্‌লে এদের একটা বড় অংশ স্বামীর সঙ্গে হয়তো সম্বন্ধ ছিন্ন কর্‌ত।...সম্প্রতি এই সম্বন্ধে আইন বিধিবদ্ধ হয়েছে। বেশ ঠাণ্ডা-প্রকৃতির চালাক মেয়েরা স্বামীর প্রতি বিদ্বেষ ও রাগঝাল মনের নিভৃতে পুষে রেখে ওপরটা উগ্র পতিভক্তির মখমল দিয়ে মুড়ে রাখে; কাক-কোকিলকে কিছু জান্‌তে দেয় না আমরণ। যারা একটু বেশী রকমের অভিমানী বা বিক্ষোভপ্রবণ, তাদের কেউ কেউ আত্মহত্যা করে, কুলত্যাগ করে, নতুবা পিতৃগৃহে এসে চিরদিনের জন্যে আশ্রয় নেয়।

এদের অসুখের বা অমিলের আদিম ও প্রধান কারণ যদি খুঁজতে যাওয়া যায়, তাহলে দেখা যাবে যে, বিয়ের প্রথম রাত্রির হঠকারিতা, রতিক্রিয়ায় স্বামীর একতরফা অধিকার কায়েমের প্রচেষ্টা, স্ত্রীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রতি ঘোর অবহেলা, স্ত্রীকে রাগোদ্দীপ্ত করা ও তার ইতিহর্ষ বা চরমানন্দ আনয়ন করার বিবিধ প্রণালী সম্বন্ধে জ্ঞানের শোচনীয় অভাব, অতিত্বরিৎ রেতঃস্খলন প্রভৃতি কার্যকারকগুলি মূলে উপস্থিত রয়েছে।..

সেকালের যুবকযুবতীদের কামকলাজ্ঞান

আমাদের দেশে প্রাচীন হিন্দু সমাজে সেয়ানা ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিবাহ-পদ্ধতি শত শত বছর ধোরে প্রচলিত ছিল। বিয়ের আগে প্রত্যেক ছেলেমেয়েকেই কামকলা সম্বন্ধে ভাবগতভাবে জ্ঞান লাভ করতে হোত কোন বয়োবৃদ্ধ বহুদর্শী বহুমানী আচার্যের কাছে,—যেমনভাবে আজকালকার ছেলেমেয়েরা কলেজে গিয়ে হিস্ট্রি, কেমিস্ট্রি, ফিজিক্স, লজিক, ফিলজফি প্রভৃতি বিষয়গুলি অধ্যয়ন করে। অনেক ধনী ব্যক্তির ছেলে এবং ক্ষেত্রবিশেষে মেয়েরা সেকালের কলারসিকা প্রসিদ্ধা গণিকাদের কাছে গিয়ে এ বিষয়ে লব্ধ জ্ঞানের ওপর শেষ তুলি বুলিয়ে আসত। গণিকারা ছিল তখনকার কালে সমাজের একটা অনিবার্য অংশ ও শ্লাঘার সামগ্রী। এখনকার অভিনেত্রী, বাইজী বা পণ্যাঙ্গনাদের সঙ্গে তাদের যদি বেশী মিল খুঁজতে যাও, তাহলে ঠক্‌বে। দেহদানটা ছিল তাদের পক্ষে গৌণ ব্যাপার। কৃষ্টিরাজ্যে তাদের দান ছিল অপরিসীম। রাজরাজড়ার দরবার থেকে মুনিঋষিদের আশ্রম পর্যন্ত তাদের গতিবিধি যেমন অবাধ ছিল, সর্বত্র তাদের সমাদর তেমনি অতুলনীয় ছিল।

প্রাচীনভারতে শিক্ষিত মার্জিতরুচির বয়ঃপ্রাপ্ত ছেলেমেয়েরা কামকলায় কার্যোপযোগী জ্ঞানার্জন কোরে তবে বিবাহ-জীবনে প্রবেশ করতে পেত। ত্রয়োদশ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদের মতো বাল্যবিবাহ তখন সমাজের প্রায় সর্বস্তরেই অজ্ঞাত ছিল। কিন্তু এখনকার সঙ্গে তখনকার প্রথার তফাৎ ছিল এইটুকু যে, তখন সব কিছু জেনে-শুনে এবং সর্বতোভাবে প্রস্তুত হোয়ে ছেলেমেয়েরা বিয়ে করত, এখনকার ছেলেমেয়েরা তা করে না। বিবাহের পূর্বে এক বা একাধিক দুশ্চারিণী বা লম্পটের সঙ্গে প্রণয়লীলায় মেতে হাতেকলমে যে জ্ঞান অর্জন করা, সেটা দাম্পত্য জীবনের পক্ষে খুব মূল্যবান অভিজ্ঞতা বোলে মনে করা চলে না। এবং এই জ্ঞান অর্জন করতে গিয়ে প্রায় স্ত্রীপুরুষেরই

দৈহিক ও মনোগত কয়েকপ্রকার ব্যাধিতে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে।

যাই হোক, তখনকার কালে যুবকযুবতীগণ যে জ্ঞান লাভ করত এবং যে জ্ঞানকে দাম্পত্য জীবনে প্রয়োগ কোরে নিজেরা সুখী হোত ও অন্যপক্ষকে সুখী করত, সেই জ্ঞানের একটা মোটামুটি পরিচয় তোমাদের দিতে যাচ্ছি। এই জ্ঞানের অনেকাংশই তোমরা বর্তমান জীবনে কাজে লাগাতে পারো এবং লাগিয়ে সুখী হোতে পারো।...

বনমানুষের হাতে বীণা

ব্যালজ্যাক তাঁর *Physiologie Du Marriage* নামক গ্রন্থের এক জায়গায় লিখ্‌ছেন, "নারী হ'ল অতি পেলব আনন্দদায়ী বাদ্যযন্ত্র বিশেষ। কিন্তু এর ক্ষীণ বেপথুমান তারগুলি চিনতে হয়, একে ধরবার রকমারি ভঙ্গী অধিগত করতে হয়, এর বিভিন্ন স্বরগ্রামের ভীরু চাবিগুলিকে মোচ্‌ড়াতে শিখতে হয়, এর বিভিন্ন তারের উপর দিয়ে সুরের খেয়ালে আঙ্গুল চালানো রপ্ত করতে হয়। কত বনমানুষ অর্থাৎ মানুষ যে নারীর স্বরূপ ও প্রকৃতি না জেনে বিয়ে করে তার ঠিক নেই!"....

এই বিখ্যাত ফরাশী ঔপন্যাসিক ও বাস্তবজীবনের নব্য দার্শনিক গড়্‌-পড়্‌তা মানুষকে ওরাউটাং বা বনমানুষের সঙ্গে তুলনা দিয়ে তার হাতে নারীরূপিনী বীণাকে তুলে ধোরেছেন। ওস্তাদের হাত থেকে বনমানুষের হাতে বীণা পড়্‌লে সে অবশ্যই শ্রুতিপীড়াদায়ক বেসুরো খাপ্‌ছাড়া কতকগুলো আওয়াজ বার করে; তারের ভেতর থেকে সুরের সুরধুনী বইয়ে দেওয়া তার সাধ্যাতীত, স্বপ্নাতীত। সুর বার করতে না পেরে বনমানুষ শেষ পর্যন্ত হয়তো রাগ কোরে তারগুলো টেনে ছেঁড়ে, সুর বাঁধার চাবিগুলোকে মুচড়ে ভাঙে!...সকল দেশেই এবং আমাদের দেশে খুব বেশী সংখ্যায়, দেখতে পাবে যে, বনমানুষের হাতে বীণা পড়েছে; বানরের গলায় মুক্তামালা ঝুলছে!

মেয়েরা যে অনেক সময় স্বামিসঙ্গমে মূক নিশ্চল যন্ত্রের মতো পোড়ে থাকে, কোন হর্ষব্যঞ্জক উত্তর প্রদান করে না, তার কারণ হ'লো—রমণকে রমণীয় করা বিষয়ে পুরুষের নিদারুণ অজ্ঞতা ও অক্ষমতা। দুনিয়ায় ক্লীব বা পুরুষত্বহীন পুরুষের সংখ্যা কম নয়, কিন্তু ক্লীবা বা নারীত্বহীনা নারী ডুমুরের ফুলের মতোই দুষ্প্রাপ্য। তবে সহবাসে রুচিহীনা ও কামশীতলা (frigid) রমণীর সংখ্যা পুরুষের তুলনায় পৃথিবীতে অনেক বেশী। বেশীর ভাগই প্রকৃতিগতভাবে বীতকামা নয়, শুধু তারা দুর্ভাগিনী এই দিক্ দিয়ে যে, যে পুরুষ অথবা যে উপচারপদ্ধতি তাদের প্রতপ্ত কোরে সুখাবহ স্তরে পৌঁছে দিতে পারে, তা তাদের অনধিগত।

উপক্রমে দৈহিক প্রস্তুতি ও কামজকেন্দ্র

স্ত্রীসহবাসে পুরুষের ধ্বজোত্থানের প্রয়োজন হয়। কিন্তু নারীর ঐ রকম একটা কিছু ব্যাপারের প্রয়োজন না থাকলেও তার সমস্ত দেহের কামজ কেন্দ্রগুলিকে উদ্দীপিত কোরে তুলতে হয়। সুস্থ পুরুষ প্রিয়তমার স্পর্শ-নিরপেক্ষ হোয়েও উত্তেজিত হোতে এবং আসঙ্গের জন্যে সর্বতোভাবে প্রস্তুত হোতে পারে, কিন্তু নারী পুরাপুরি পারে না। নারীর দেহের কোথায় কোথায় কামজ কেন্দ্র আছে, কোথায় কোথায় কিভাবে স্পর্শ করলে তারা প্রতপ্তকামা হয়, তার সন্ধান ও আবিষ্কার বোধহয় হিন্দুরাই সকলের আগে করেছিলেন। গণ্ড, ওষ্ঠ, জিহ্বা, স্তনবৃন্ত, ভগাঙ্কুর (clitoris)—এই কয়টি কামজ কেন্দ্রের সঙ্গে আমাদের অনেকেরই পরিচয় আছে। কিন্তু পিঠের তলদেশে উভয় নিতম্বের খাঁজের ঊর্ধ্বভাগ, কানের সুকোমল নিম্নাংশ, চোখের পাতা, নাভিমূল, রতিশেল (যোনির উপরাংশে কূর্মপৃষ্ঠবৎ লোমশ স্থান), গুহ্যদ্বারের চক্রাকার বহিরংশ, বাহুমূলের তলদেশ প্রভৃতি আরো বহু ছোটখাটো কামজ কেন্দ্রের কথা সাধারণ মানুষের নিকট অজ্ঞাত। করাঙ্গুলি, ওষ্ঠ প্রভৃতি-দ্বারা এই

সব কেন্দ্র স্পর্শ করলে রমণীর দেহ পুলকরাগরঞ্জিত হয়—এতে আর সন্দেহ নেই। "অনঙ্গরঙ্গের" গ্রন্থকার কল্যাণমল্ল আবার এমন কথাও বোলে গেছেন যে, রমণীর কাম এক-এক তিথিতে এক-এক দেহাংশ-কেন্দ্রে অবস্থান করে। কিন্তু বর্তমান যুগে এ উক্তির বৈজ্ঞানিক ও ভূয়োদর্শনলব্ধ সমর্থন পাওয়া যায়নি।

যাই হোক্, রমণীকে প্রদেয় সমস্ত উপচারগুলির মধ্যে আলিঙ্গন ও চুম্বনের স্থান সকলের উচ্চে, তা বোধহয় না বল্‌লেও চল্‌বে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী যে সব আরবীয় প্রেমতাত্ত্বিকদের বই আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে, তার মধ্যে অল্ জহীজ, অল্ নাহ্‌লী, হাজী অল্ হুমান্ প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; এঁরা সকলেই বার-বার সঙ্গমোপ-ক্রমে উপচার প্রয়োগের আবশ্যকতা সম্বন্ধে উপদেশ দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে একজন বলেছেন যে, তুলসীপাতা হাতে নিয়ে না রগড়ালে যেমন সে তার গন্ধও দেয় না—রসও দেয় না, তেমনি মেয়েদের চুম্বন, আলিঙ্গন, অঙ্গাদি পেষণ, চোষণ প্রভৃতি না করলে তারা ভালবাসা দেয় না। 'সুরভিকাননে'র গ্রন্থকার শেখ্ নেফ্‌জাউই বল্‌ছেন, "আমায় বিশ্বাস কর তোমরা,—চুম্বন, মৃদু চিম্‌টি, অধরচোষণ, ঘন আলিঙ্গন, চুচুকে ওষ্ঠ-প্রদান এবং সদ্যোনিঃসৃত মুখলালা শোষণ—এই কয়টি জিনিস দিয়ে তরুণীর প্রেমকে দীর্ঘস্থায়ী করতে পারা যায়।"...

দ্বাদশালিঙ্গন

গরিলারা একরকমের আলিঙ্গনই জানে, কিন্তু মানুষের নানারকমের আলিঙ্গনই জানা উচিত। আলিঙ্গন জিনিসটা এমন একটা উপচার যেটা প্রয়োগ করার ফলে রমণীর একাধিক কামজ কেন্দ্র যুগপৎ সংপেষিত ও সংঘৃষ্ট হয়। হিন্দু কামশাস্ত্রকারগণ দ্বাদশপ্রকারের আলিঙ্গন সংজ্ঞাবদ্ধ কোরেছেন। এই সকল উপগূহন স্ত্রীপুরুষ দুই দলই শিখে রাখতে ও

প্রয়োগ কর্‌তে পারে। এই বারো রকম আলিঙ্গনের চার রকম অরমিতা কন্যা বা সদ্যোবিবাহিতা দম্পতির জন্য, বাকি আট রকম কামরসজ্ঞ নর-নারীর জন্যে। প্রথম শ্রেণীর চার রকমের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে যাচ্ছি।—

(১) **স্পৃষ্টক**। অন্য লোকের উপস্থিতির জন্য অন্যবিধ আলিঙ্গন অসাধ্য হওয়ায়, প্রেমিকার পাশ দিয়ে যাবার সময় (হাত, বুক বা পেট দিয়ে) তার অঙ্গে সামান্য একটু স্পর্শদান করার নাম স্পৃষ্টক।

(২) **বিদ্ধক**। নায়ক দিবাভাগে কোনো নির্জনকক্ষে উপবিষ্ট থাক্‌বার সময় নবযৌবনা নায়িকা যদি কোন কিছু গ্রহণ কর্‌বার ছলে নায়কের কাছে এসে তার উন্নত পয়োধর নায়কের অঙ্গে সজোরে চেপে ধরে, তাহলে সেই আলিঙ্গনকে বলে বিদ্ধক।

(৩) **উদ্‌ঘৃষ্টক**। কোন বিজনপ্রদেশে, অন্ধকারে, কোন পর্বোপলক্ষে দেবালয়াদিতে, নাটকাদি অভিনয়ের স্থানে, যেখানে লোকের ঠেলাঠেলি —এমন জায়গায় ধীরে ধীরে বহুক্ষণ ধোরে নায়িকার গাত্রে নায়কের যে গাত্রঘর্ষণ সংসাধিত হয়, তার নাম উদ্‌ঘৃষ্টক। [পরস্পরের ঘর্ষণকে 'উদ্‌ঘৃষ্টক' ও একের ঘর্ষণকে 'ঘৃষ্টক' বলা হয়।]

(৪) **পীড়িতক**। উদ্‌ঘৃষ্টক আলিঙ্গন করবার সময় যদি একজন কোন দেওয়ালে দু' হাতের চাপ দেয় অথবা কোন থাম বা স্তম্ভাকার কোন জিনিসকে দুই বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরে, তাহলে তার নাম হয় পীড়িতক। এই আলিঙ্গনে আলিঙ্গিতের ওপর অথবা থামের ওপর বেশী জোর পড়তে পারে।

এইবার বাকি আট রকমের আলিঙ্গনের একটু পরিচয় দিই।—

(৫) **বল্লরীবেষ্টিতক** বা **লতাবেষ্টিতক**। যখন নায়কনায়িকা দুজনেই দাঁড়িয়ে আছে, তখন যদি নায়িকা নায়কের সামনে এসে দুই বাহু দিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরে, দু'পা দিয়ে তার কোমর জড়িয়ে ধরে এবং তাকে চুম্বন করার উদ্দেশ্যে নিজের মুখখানি তুলে দিয়ে নায়কের

মুখখানিকে নামিয়ে নেয়, তাহলে তাকে বলা হয় বল্লরীবেষ্টিতক বা লতাবেষ্টিতক।

(৬) **বৃক্ষাধিরূঢ়ক**। এই আলিঙ্গনও প্রয়োগ কর্‌তে হয় যখন উভয়ে দণ্ডায়মান অবস্থায় থাকে। নায়িকা যখন এক পা দিয়ে নায়কের এক পায়ের পাতার মূলদেশ ও অন্য পা দিয়ে তার কটিদেশ জড়িয়ে ধরে, এক হাত দিয়ে সে নায়কের পৃষ্ঠ বেষ্টন করে এবং অন্য হাতখানি গলায় জড়িয়ে দিয়ে নায়কের মুখখানিকে একটু অবনমিত করার চেষ্টা করে, তখন তাকে বলা হয় বৃক্ষাধিরূঢ়ক আলিঙ্গন।

(৭) **তিলতণ্ডুলক**। এই আলিঙ্গনে নায়ক ও নায়িকা দুজনেই শুয়ে থাক্‌বে। দুজনে পরস্পরকে দুইবাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরবে, একজনের একখানি উরু অপরের দুই উরুর মধ্যে সংস্থিত থাকবে ; একের দেহের সম্মুখাংশ অপরের দেহের সম্মুখাংশের সঙ্গে গাঢ়ভাবে সংলগ্ন থাক্‌বে। এই রকম আলিঙ্গনের নাম তিলতণ্ডুলক।

(৮) **ক্ষীরনীরক**। নায়কের ক্রোড়ে মুখোমুখিভাবে উপবিষ্টা নায়িকাকে অথবা শয়নগতা নায়িকাকে যখন নায়ক এমন জোরে চেপে ধরে যে, হাড়গুলো পর্যন্ত মড়্‌মড়্‌ করে এবং যখন উভয়ে পরস্পরের দেহের সর্বাঙ্গের সঙ্গে যেন একেবারে মিশে যায়, তখন তাকে বলে ক্ষীরনীরক আলিঙ্গন।

(৯) **উরূপগূহন**। পার্শ্বশায়িত অবস্থায় স্ত্রী বা পুরুষ যখন অপরের একটি অথবা দুটি উরুকে নিজের উরু দিয়ে সাঁড়াশীর মতো চেপে ধরে, তখন তাকে উরূপগূহন আলিঙ্গন বলে।

(১০) **জঘনোপগূহন**। নায়ক চিৎ হোয়ে শুয়ে থাক্‌বে, নায়িকা তার কেশকলাপ এলিয়ে দিয়ে নায়কের উরুদ্বয়ের উর্ধ্বভাগের ওপর হাঁটু গেড়ে বোসে নিজের উরুদ্বয় দিয়ে তার পার্শ্বভাগ জোরে চেপে ধর্‌বে এবং দংশন-চুম্বনাদির জন্যে নিম্নাভিমুখী হবে। এইরকম আলিঙ্গনকে জঘনোপগূহন বলে।

(১১) **স্তনালিঙ্গন**। উর্ধ্বারূঢ়া নায়িকা শায়িত নায়কের বক্ষের উপর স্তনদ্বয় এমনভাবে চেপে ধরে যাতে ওর দেহের সমস্ত ভার স্তনদ্বয়ের ওপর সঞ্চালিত হয়। এইভাবে নায়ক স্তনভারাক্রান্ত হোয়ে হৃদয়োপরি একরকম পিণ্ডীকৃত স্পর্শসুখ অনুভব করে। একে বলে স্তনালিঙ্গন।

(১২) **ললাটিকা**। চিৎভাবে শায়ন নায়কের ওপর যখন নায়িকা আরূঢ় হোয়ে, তার বুকে বুক, ওষ্ঠে ওষ্ঠ, মুখে মুখ, চক্ষুতে চক্ষু এবং কপালে কপাল সংলগ্ন কোরে মুখোমুখিভাবে শয়ন করে এবং ললাট দিয়ে নায়কের ললাটের ওপর মৃদু মৃদু আঘাত করে, তখন সেই আলিঙ্গনের নাম ললাটিকা।

শাস্ত্রকারগণ এই সকল আলিঙ্গনের বর্ণনা দিয়ে বলছেন যে, এইগুলি প্রত্যেকেরই অধিগত কোরে রাখা কর্তব্য। যার যখন যে রকম আলিঙ্গন দিতে ও নিতে ভালো লাগে, তার তখন সেইটি প্রয়োগ করা কর্তব্য। যখন রাগ উদ্দীপিত হয়, তখন সুরতক্রিয়াই তার নিজের সুবিধা-অসুবিধা স্থির কোরে নেয়। তখন যদি উপরোক্ত দফাগুলির অতিরিক্ত কোন আলিঙ্গনের ভঙ্গী কেউ গ্রহণ করে, তাতে ক্ষতি নেই।...

গাত্রগন্ধ ও মুখবাস

তারপর চুম্বন সম্বন্ধে শাস্ত্রকাররা বলছেন যে, এই উপচারটি রমণের পূর্বে উভয়ের রাগোদ্দীপনের জন্যে যেমন ব্যবহার করা যায়, তেমনি রমণকালেও ব্যবহার করা চলে। আসঙ্গকালে যে চুম্বন প্রযুক্ত হয়, তার সঙ্গে সঙ্গে অথবা পর পর দংশন, নখের আঁচড়, নানা অঙ্গে মৃদু আঘাত (প্রহলন), রকমারি অস্ফুট শব্দ (সীৎকার) প্রয়োগ করা বিধেয়। এইগুলো সম্বন্ধে পরে কিছু বল্‌ব, এখন চুম্বন সম্বন্ধে কিছু বলি।

চুম্বনে চারটি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও চারটি তন্মাত্র যুগপৎ নিযুক্ত হয়। কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা (বা ওষ্ঠ) ও ত্বক্; রস, শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শ। সূর্যালোকে,

চন্দ্রালোকে কিংবা কোন কৃত্রিম আলোয় চুম্বন করলে চক্ষু বা রূপ-তন্মাত্রও কাজে লাগে। অতি ধীরে চুম্বনেও একটু-না-একটু শব্দ হয় এবং চুম্বনের প্রকারভেদে শব্দেরও প্রকারভেদ হয়। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ বলছেন যে, আলিঙ্গন ও চুম্বনকালে প্রেমিকপ্রেমিকার গাত্র ও মুখ থেকে যে একটি বিশিষ্ট গন্ধ বেরোয়, সেটি পরস্পরের নিকট অত্যন্ত উপভোগ্য হয়। প্রত্যেকেরই গাত্রগন্ধ—এমন কি ঘর্মগন্ধের মধ্যে স্থূল ও সূক্ষ্ম প্রকার-ভেদ আছে। প্রত্যেক নর কিংবা নারী এক বা একাধিক গাত্রগন্ধ ভালবাসে এবং সেই গন্ধের দ্বারা অপরের প্রতি আকৃষ্ট ও উত্তেজিত হয়।

পশুরা গাত্রগন্ধ (বা যোনি প্রদেশীয় গন্ধ) দ্বারা অন্য পক্ষ কামাসক্ত ও আসঙ্গের উপযুক্ত কিনা বুঝতে পারে। এক এক জাতীয় হরিণের কামোদ্রেক-কালে গাত্র থেকে, নাভি থেকে ও সাধনযন্ত্র থেকে একপ্রকার উগ্র ও প্রিয় সুবাস নির্গত হোয়ে চারিদিকের বাতাসকে ভারাক্রান্ত করে। সে নিজে এই গন্ধ যত শোঁকে, ততই ক্ষিপ্ত হোয়ে হরিণীর সন্ধানে চারিদিকে ছুটোছুটি করতে থাকে। হরিণীরাও এই গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে তার সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। কবি যে বোলেছেন "পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি কস্তূরীমৃগ সম আপন গন্ধে মম", সেটা নিছক্ কাব্যলোকের স্বপ্নসুষমা নয়!

গাত্রগন্ধ ব্যতীত প্রত্যেকের নিঃশ্বাস ও মুখেরও এক-একপ্রকার গন্ধ আছে। যতই পরিচ্ছন্ন ও মার্জিত রাখা হোক্ না কেন, অনেকেরই মুখে কিছু-না-কিছু দুর্গন্ধ হবেই। রাগোদ্দীপ্ত প্রেমিকপ্রেমিকার কাছে দুর্গন্ধও অনেকখানি উপেক্ষণীয় বা সহনীয় হয়, এমন কি ক্ষেত্রবিশেষে আমন্ত্রণজনকও হয়। কিন্তু পূর্ণ উদ্দীপনার পূর্বে পাছে কোনক্রমে গাত্রগন্ধ ও মুখগন্ধ প্রেমভাজনের কাছে বিরাগোৎপাদক হয়, সেইজন্যে সকলদেশেই মিলনপ্রাক্কালে নায়কনায়িকা গায়ে কৃত্রিম সুরভিসার, অগুরুচন্দন মাখে, ফুলের মালা পরে, তাম্বুল ও সুগন্ধি মশলা চর্বণ করে। বহু রসজ্ঞা রমণীই জর্দা, সুর্তি, কিমাম প্রভৃতি দিয়ে পান খায়, কেউবা দুই ঠোঁটে

আতর মাখে। আধুনিকাদের লিপ্‌স্টিকেও কিছু মিষ্ট মৃদু গন্ধ থাকে; কিন্তু একাধিক কারণে তা আমি অনুমোদন করি না।

এমন স্ত্রীপুরুষ সর্বদেশেই দেখা যায় যাদের স্বাভাবিক গাত্রগন্ধ, শ্বাসগন্ধ ও মুখগন্ধ রম্য, রুচিকর। স্বভাবসঙ্গতভাবে কারো কারো গা দিয়ে বাদামের গন্ধ, কাঁচা দুধের গন্ধ, মৃদু মৃগনাভির গন্ধ, দারুচিনির গন্ধ, ভিজে মাটির গন্ধ প্রভৃতি বেরোয়; মুখ দিয়ে রকমারি ফুল বা ফলের গন্ধ বেরোয়। কোন কোন মেয়ের মুখে কেয়াফুলের বা গোলাপের গন্ধ বা কাঁচা দাড়িমের গন্ধ পাওয়া যায়। শোনা যায়, রোম-সম্রাট্ নেরোর স্ত্রী, পপ্পিয়ার মুখে বৈচিফলের গন্ধ লেগে থাক্‌ত।

ত্রয়োদশ চুম্বন

যাহোক, 'কামসূত্র'-কার দেহের কোন্ কোন্ জায়গায় চুম্বন প্রয়োগ করা যায় তার একটি ফিরিস্তি দিয়েছেন। যথা,—ললাট, অলক, গণ্ড, নয়ন (মুদ্রিত চক্ষুর পাতা), বক্ষ, স্তনশীর্ষ, ওষ্ঠ, মুখমধ্যভাগ (জিহ্বাগ্র)। এই আটটি স্থান ছাড়া উরুসন্ধি, বাহুমূল ও নাভিমূলেও চুম্বন করা কোন কোন দেশে জাতিবিশেষের মধ্যে প্রচলিত আছে। টীকাকার 'নাভিমূল' শব্দের অর্থ বোলেছেন 'বরাঙ্গ'; বরাঙ্গ মানে উপস্থ বা যোনি। এই স্থানটাতে চুম্বন, দংশন, চোষণাদি উপচারক্রিয়া প্রদানের রীতি সর্বকালে সর্বদেশেই বহু প্রেমিকপ্রেমিকার দ্বারা আচরিত হোয়ে আস্‌ছে। প্রাচীন পুঁথিপত্র, শাস্ত্রগ্রন্থ, চিত্র ও ভাস্কর্যের নিদর্শনে এর অকাট্য প্রমাণ আছে। ডাঃ ভ্যান্ ডি ভেল্‌ডি প্রমুখ পাশ্চাত্ত্য মহাজনগণ পতিপত্নীদের পরস্পরের মধ্যে এইরূপ উপচারের প্রয়োজনীয়তা অকপটভাবে সমর্থন করেছেন। এঁদের মতে—অনভিজ্ঞা নবীনা বধূর অসংবরণীয় লজ্জা, ভয় ও কামেচ্ছার ন্যূনতা দূর করবার এই হোলো প্রকৃষ্ট উপায়।

এইবার কতপ্রকারের চুম্বন আছে, তাই বলি।

(১) **নিমিতক**। নায়কের নির্বন্ধাতিশয্যে কুমারী অথবা সদ্য-পরিণীতা পত্নী কোনমতে ওষ্ঠসম্পুট দিয়ে আল্‌তোভাবে ত্বরিৎ গতিতে তাহার মুখস্পর্শ করলে, তাকে বলে নিমিতক।

(২) **স্ফুরিতক**। নায়িকার মুখমধ্যে নায়ক অধর প্রবিষ্ট করিয়ে দিলে নায়িকা যখন অধরদ্বয় ফাঁক রেখে মুখ ঈষৎ সরিয়ে নেয়, অথচ নায়ক তার অধর বের কোরে নেবার চেষ্টা করলে সলজ্জা আগ্রহে তার ঠোঁট দুখানি ঈষৎ চেপে ধরে, তখন তাকে বলে স্ফুরিতক।

(৩) **ঘট্টিতক**। নিজের করতালু-দ্বারা নায়কের নয়নদ্বয় আচ্ছাদিত কোরে এবং নিজের নয়ন নিমীলিত কোরে নায়িকা যখন নায়কের অধরপ্রান্তের ওপর নিজের জিহ্বাগ্র ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বুলোতে থাকে, তখন তাকে বলে ঘট্টিতক।

(৪) **সম**। মুখোমুখী হয়ে সমানে-সমানে পরস্পরের ওষ্ঠমধ্যে ওষ্ঠগ্রহণের নাম সম।

(৫) **বক্র বা তির্যক্**। একে অপরের পাশে বা পশ্চাতে দাঁড়িয়ে তার মুখখানি সুবিধামতো ঘুরিয়ে নিয়ে তার ওষ্ঠদ্বয় নিজের বর্তুলাকার ওষ্ঠের মধ্যে গ্রহণ করার নাম বক্র বা তির্যক্।

(৬) **ভ্রান্ত বা উদ্‌ভ্রান্ত**। চিবুক ও মস্তক হাত দিয়ে ধোরে ঘুরিয়ে বিভিন্ন দিক্ থেকে যে পুনঃপুন চুম্বন-দান, তাকে বলে ভ্রান্ত বা উদ্‌ভ্রান্ত।

(৭) **অবপীড়িতক**। ভ্রান্ত চুম্বনকালে যদি একের ওষ্ঠ অপরের ওষ্ঠে অত্যন্ত কঠিনভাবে সঞ্চাপিত করা হয়, তাহলে তাকে বলে অবপীড়িতক।

(৮) **শুদ্ধাবপীড়িতক**। যদি উভয়ে উভয়ের ওষ্ঠ নাতিকঠিনভাবে চেপে ধরে, তাহলে তাকে বলা হয় শুদ্ধাবপীড়িতক।

(৯) **চুষণ** বা **অধরপান**। একে যদি অপরের জিহ্বাগ্র চোষণ ও তৎসহিত আগত মুখলালা শোষণ করে, তাহলে তাকে বলে চুষণ বা অধরপান।

(১০) **আকৃষ্ট**। অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীর দ্বারা নীচের ঠোঁটখানি দুমড়ে একটু বাইরে টেনে নিয়ে নিজের ওষ্ঠপুটদ্বারা শোষণ করার নাম আকৃষ্ট।

(১১) **উত্তরচুম্বিত**। নায়ক যখন অল্প সঞ্চাপ দিয়ে নায়িকার উপরের ওষ্ঠ এবং নায়িকা যখন নায়কের নিম্নৌষ্ঠ চোষণ করে, তখন তাকে বলা হয় উত্তরচুম্বিত।

(১২) **সম্পুটক**। একের গুটানো ও সুচালো ওষ্ঠদ্বয় যখন অন্যে দুই ওষ্ঠের মধ্যে গ্রহণ কোরে চোষণ করে, তখন তাকে বলে সম্পুটক।

(১৩) **জিহ্বাযুদ্ধ**। যখন উভয়ে ক্রমান্বয়ে পরস্পরের জিহ্বা-দ্বারা দন্তগুলি মার্জিত করে, জিহ্বা চোষণ ও ঘর্ষণ করে এবং নিজের জিহ্বা ভিতরের দিকে প্রসারিত কোরে উপরের তালুতে স্পর্শ করায়, তখন তাকে বলে জিহ্বাযুদ্ধ। ফ্রান্সে বৃটানি প্রদেশের কোন কোন অঞ্চলে অবিবাহিতা তরুণ-তরুণী এবং নবদম্পতিরা এইভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধোরে অক্লান্তভাবে জিহ্বাযুদ্ধ করে। সেখানে এটা নাকি সনাতন লোকপ্রিয় প্রথা।

আরো নানারকম চুম্বনের বৃত্তান্ত আমরা হিন্দুশাস্ত্রে পাই, কিন্তু বাহুল্যভয়ে সেগুলির আর উল্লেখ করলাম না। আরবী গ্রন্থকাররাও চুম্বনের এত প্রকারভেদ না জানলেও এর আবশ্যকতাকে এবং সুকৌশল প্রয়োগকে স্বীকার কোরে গিয়েছেন। শেখ নেফ্‌জাউই পুরুষকে উপদেশ দিয়েছেন নারীর সম্প্রসারিত জিহ্বাগ্র নিজের মুখমধ্যে গ্রহণ কোরে মৃদু ও কোমলভাবে দংশন করতে; তাহোলে চাক-ভাঙা মধুর মত লালা নিঃসৃত হবে। এই লালার দ্বারা সিক্ত হোয়ে নায়কের জিহ্বা অপরের তালুকে স্পর্শ করবে। এই রকম চুম্বনের ফলে স্ত্রীলোকের মুখমধ্যে এক সুমধুর শব্দ উত্থিত হয়। এতে কোরে দেহের প্রত্যেক পেশীতন্তুর মধ্য দিয়ে এক অপূর্ব পুলককম্পনের প্রবাহ বইতে থাকে এবং শিরায় শিরায় শ্রেষ্ঠ সুরার চেয়ে গাঢ়তর মাদকতার সঞ্চার হয়।

—চতুর্থ পাঠ—

নখদান, দশনচ্ছেদ্য প্রভৃতি

পতিপত্নী সুরতে সম্মিলিত হলে, পরস্পরের অনুরাগকে দ্বিগুণ বর্ধিত করবার জন্যে নখদ্বারা শরীরের বিভিন্ন অংশে যে সঞ্চাপ, সংঘর্ষণ প্রভৃতি করা হয়, তার নাম "নখদান" বা "নখবিলেখন"। দন্তদ্বারা মৃদু ও মধ্যভাবে শরীরের বিভিন্ন অংশে দংশন করা ও অঙ্গবিশেষে চিহ্ন অঙ্কিত করার নাম "দশনচ্ছেদ্য"। উপরন্তু অঙ্গুলি দ্বারা, করতালু দ্বারা অথবা মুষ্টিদ্বারা শরীরের বিভিন্ন অংশে আঘাত করা বা কোন অঙ্গ অল্পবিস্তর টিপে দেওয়ার নাম "প্রহণন"।

এগুলো ছাড়া আরো নানারকম উপচার আছে। এই সব উপচারের স্বরূপ-নির্ণয় ও সংজ্ঞা-প্রদান—হিন্দু-কামশাস্ত্র ছাড়া আর কোথাও করা হয়নি। এগুলো প্রাচীনতম যুগ থেকে হিন্দু প্রেমিকপ্রেমিকাদের দ্বারা আচরিত হোত; হিন্দুদের হাতেই এর হয় চরম উৎকর্ষসাধন।

নখদানের নিয়ম ও প্রকারভেদ

নখের আঁচড় দেওয়া বললেই সাধারণের মনে যেন একটা আতঙ্কের সঞ্চার হয়; কথাটা শুনলেই তারা কুকুর-বেরাল-বাঁদর-শেয়ালের আঁচড় মনে আনে। কামোত্তজনা যখন ঊর্ধ্বমার্গে উঠছে, প্রেমিকপ্রেমিকা যখন সবে রতিরত হয়েছে, তখন নিপুণতার সঙ্গে নখবিলেখন করাটা কত যে সুখাবহ ও কাম্য, তা আমরা এককালে এর উদ্ভাবক হোয়েও আজকের দিনে ভুলতে বসেছি। বাৎস্যায়ন বলেন যে, প্রথম-সঙ্গমকালে, প্রবাস থেকে প্রত্যাগমন করার পর প্রথম অভিগমন-কালে, প্রবাসে

যাত্রা-কালে এবং ক্রুদ্ধা নায়িকা প্রসন্না হলে, তখন নখবিলেখন প্রয়োগ কর্তব্য। কিন্তু তিনি স্বভাবত কামক্রীড়ায় চণ্ডবেগ পতিপত্নীকেই প্রতি-সঙ্গমে নখবিলেখন প্রয়োগ কোরতে পরামর্শ দিয়েছেন। মধ্যবেগ ও মন্দবেগ দম্পতিরা নিম্নবর্ণিত শুধু প্রথমোক্ত কয়টির এবং তা-ওমাঝে মাঝে সদ্ব্যবহার করবে। তবে "আচ্ছুরিতক" নখদান সকল শ্রেণীর প্রেমিক-প্রেমিকা সর্বদা উপভোগ করে।

কল্যাণমল্ল নখবিলেখন কোন্ কোন্ অঙ্গপ্রত্যঙ্গে প্রয়োগ করা বিধেয় তার নির্দেশ দিয়েছেন। সেগুলি হ'ল—ঘাড়, বাহু, উরু, স্তনমূল, পৃষ্ঠদেশ, হস্তমূল (বগল), দেহকাণ্ডের দুই পার্শ্ব, সমস্ত বক্ষোদেশ, কোমর ও নিতম্বের উর্ধ্বভাগ, রতিশৈল ও যোনিদেশীয় মাংসল স্থান এবং উভয় গণ্ডদ্বয়। পণ্ডিত সুবর্ণনাভ বলেন যে, যে নায়ক-নায়িকা অতিরিক্ত কামোত্তপ্ত হোয়ে রতিক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হয়েছে, তাদের আর স্থান-অস্থান কিছু জ্ঞান থাকার কথা নয়, তখন যেখানে খুশি নখদান করা চলে।

বিলেখনের পক্ষে কোন নখ স্বভাবত উত্তম মধ্যম ও অধম, নখের বহিঃপ্রান্ত কিভাবে কতদিন অন্তর কাটা উচিত এবং নখদানের সৌজন্য-সম্মত রীতি-র বিস্তৃত আলোচনা—সে সবে করার জায়গা পাব না এ বইয়ে। তবে এইটুকু বললেই বোধহয় যথেষ্ট হবে যে, তিনদিন অন্তর নতুবা সপ্তাহে অন্তত একবার কোরে নখ কাটতে হবেই ; নখের তলায় যেন ময়লা বসতে না পারে এবং নখপ্রান্তগুলি যেন অর্ধচন্দ্রাকারে কাটা থাকে।...এইবার কোন্ নখ বিলেখনের পক্ষে উত্তম তার একটু আভাস দিয়ে যাই। যে নখের প্রান্তভাগ অর্ধচন্দ্রাকার, যা চোকো নয়—চ্যাপ্টা নয়, বেশ শক্ত ও অভঙ্গুর, যার প্রান্ত করাতের মত কাটাকাটা নয়, যায় ওপর কোন দাগ নেই, যার গাত্র মসৃণ অর্ধস্বচ্ছ রক্তিমাভ, যার প্রান্ত বেশ কোমল ও ভোঁতা, সেই নখই সর্বোত্তম।

এইবার আটপ্রকার নখদানের কথা বল্‌ছি।

(১) **আচ্ছুরিতক**। একে আমরা চলিত কথায় 'সুড়্‌সুড়ি দেওয়া' বলি। এতে হাতের আঙুলগুলি ঈষৎ বক্র ও পরস্পর সামান্য ফাঁক কোরে, আঙুলের মাথা নায়ক বা নায়িকার ওষ্ঠপ্রান্তে, গণ্ড, বক্ষস্থল, স্তন, পৃষ্ঠের মধ্যবর্তী অংশ, কটিদেশ, নিতম্বের উর্ধ্বভাগ, উরুর ভিতরের অংশ, ধড়ের দুই পাশের ওপর দিয়ে মৃদুভাবে বুলিয়ে যেতে হয়। এইরূপ নখদানের ফলে সর্বশরীর রোমাঞ্চিত এবং সমস্ত কামজ কেন্দ্রগুলি জাগ্রত হয়। এতে নখের চেয়ে আঙুলের ডগাই বেশী কাজে লাগে।

(২) **অর্ধচন্দ্রক**। এতে হাতের আঙুলগুলি একটু ভেতর দিকে মুড়ে এবং গোলাকৃতি কোরে গলার পেছনে কাঁধের মাংসল স্থানে ও স্তনোপরি নখের চাপ দিতে হয়—যাতে অতি অল্পক্ষণের জন্যে ওই জায়গাগুলোতে নখের অর্ধচন্দ্রাকার রেখা অঙ্কিত হোয়ে যায়।

(৩) **রেখা**। মধ্যমা ও তর্জ্জনীর যে-কোন একটি, অথবা পরস্পর দুটি কিংবা তিনটি আঙুলের নখ দিয়ে অল্প পরিমিত স্থানে প্রায় সোজাসুজি যে চিহ্ন অঙ্কিত হয়, তাকে রেখা বলে।

(৪) **মণ্ডলক**। দুটি আঙুলের মাথা পরস্পর একত্র জোড়া লাগিয়ে যখন প্রিয়ার রতিশৈলে (যোনিপ্রদেশীয় কূর্মপৃষ্ঠবৎ লোমশ স্থানে), কটিদেশে, নিতম্বের উপরিভাগে এবং কুঁচকিতে প্রায় চিম্‌টি কাটার মতো এমনভাবে নখ বসিয়ে দেওয়া হয়, যাতে প্রায়-গোলাকার এক-একটা দাগ জন্মায়, তাহলে তাকে বলে মণ্ডলক।

(৫) **ব্যাঘ্রপদক**। করতালু স্তনশীর্ষে রেখে পাঁচটি আঙুল বিস্তারিত কোরে যখন তার মূলদেশে থেকে আরম্ভ কোরে বৃন্তমূল পর্যন্ত পাঁচ আঙুলের নখচিহ্ন ঈষৎ গভীরভাবে বসিয়ে দেওয়া হয়, তখন তাকে বলে ব্যাঘ্রপদক।

(৬) **ময়ূরপদক**। যখন নায়ক একটি স্তনবৃন্তের ওপর নিজের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মাথাটি ঠেসে রেখে বাকি চারটি আঙুলের মাথা স্তনের মূলদেশে

অর্ধচন্দ্রাকারে রাখে এবং নখ দিয়ে ঠেসে ধরে, তখন তাকে ময়ূরপদক নখদান বলা হয়।

(৭) **শশপ্লুতক**। রমণীর স্তনবৃন্তের মূলদেশস্থ কৃষ্ণাভ মণ্ডলে হাতের পাঁচটি আঙুল প্রায় এক কোরে খরগোসের পদচিহ্নের মতো যে নখচিহ্ন অঙ্কিত কোরে দেওয়া হয়, তাকে বলে শশপ্লুতক।

(৮) **উৎপলপত্রক**। পাঁচটি আঙুল বিস্তৃত ও ঈষৎ বক্র কোরে স্ত্রীলোকের স্তনগাত্রে, নিতম্বোর্ধ্বে ও নিম্নোদরে পদ্মপত্রাকারে যে নখরেখা অঙ্কন করা হয়, তাকে বলে উৎপলপত্রক।

(৯) **স্মারণীয়ক**। প্রচ্ছন্ন নায়ক অর্থাৎ গোপনে যে কালেভদ্রে অবৈধভাবে নায়িকার সঙ্গে মিলিত হবার সুযোগ পায়, এবং প্রবাস-গমনোন্মুখ পতি—নায়িকার উরুযুগলে ও স্তনপৃষ্ঠে পাঁচ আঙুলের নখ দিয়ে পর পর চারটি কিংবা তিনটি অপেক্ষাকৃত গভীর যে রেখা কেটে দেয়, তাকে বলে স্মারণীয়ক। এই রেখাগুলিতে চামড়া ঈষৎ ছোড়ে গিয়ে ঠিক্ রক্ত বেরোর না বটে, কিন্তু রক্ত জমাট বেঁধে কালসিটে পোড়ে যায়; এবং এই দাগ দিন কয়েক স্থায়ী হয়। নায়িকা নিজেও উপরোক্ত নায়কের অঙ্গে স্মারণীয়ক নখদান কর্‌তে পরে।...

দশনচ্ছেদ্যের প্রকারভেদ

এইবার দশনচ্ছেদ্যের কিছু পরিচয় দিই। কামজ দংশনের রীতি আমরা বহু স্তন্যপায়ী জন্তু ও পক্ষীর মধ্যে দেখ্‌তে পাই, এই ধরণের উপচার প্রয়োগ করতে গিয়ে অনেক সময় পুরুষ-পশু তার সঙ্গিনীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ক্ষতবিক্ষত কোরে ফেলে। মানুষ এই কামজ দংশনের প্রবৃত্তিকে কলাসম্মত বিভিন্ন মঞ্জুল শৈলীতে প্রবাহিত করেছে। হিন্দু প্রেমতাত্ত্বিকগণ একে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত কোরে তার প্রত্যেকটির প্রকৃতি-নির্দেশ কোরেছেন। সর্বদেশে এমন চণ্ডবেগ স্ত্রীপুরুষ সর্বদাই ছিল ও আছে যারা সম্ভোগকালে পরস্পরের দেহ দংশনদ্বারা আহত ও

রক্তাক্ত কোরে দিয়েছে ও দেয়। যতক্ষণ পর্যন্ত এই দশনাঘাত গ্রহণ-কারীর নিকট উপভোগ্য ও সুখাবহ হবে, ততক্ষণ তাকে আপত্তিকর বা ক্ষতিকর বলা চলে না,—বিশারদগণ এই অভিমত প্রকাশ করেছেন।

আমাদের দেশে সচরাচর পুরুষের দিক্ থেকেই দশনচ্ছেদ্যের প্রবৃত্তিকে সক্রিয় হোতে দেখা যায়। অত্যন্ত চণ্ডবেগা নারীও, বিশেষভাবে পুরস্ত্রীরা, ক্বচিৎ দশনচ্ছেদ্য-দানে প্রলুব্ধ হয়। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে গণিকা বা প্রচ্ছন্ন নায়িকা দুষ্টুমি কোরে—ঠিক অনুরাগের আতিশয্যে নয়—নায়কের গণ্ডে, স্কন্ধে, বক্ষে নির্দয় দশনচিহ্ন এঁকে দেয়। ইউরোপ-আমেরিকায়—বিশেষভাবে কন্টিনেন্টে—সর্বশ্রেণী ও সর্বস্তরের মেয়েদের মধ্যে এই উপচার-দানের প্রবৃত্তি কমবেশী প্রবলভাবে বর্তমান। ডাঃ ভ্যান্ ডি ভিল্‌ডি তাঁর *Ideal Marriage*এর এক জায়গায় বলছেন, "When love play culminates and the greatest possible intensity of feeling in expressed in kisses, both partners tend to use their teeth and in so doing there is naught abnormal, morbid or perverse."

বাৎস্যায়ন বলেন—ওষ্ঠের উপরিভাগ (নাসিকার নিম্নদেশে), জিহ্বা ও নয়নদ্বয় ব্যতিরেকে শরীরের অন্য সমস্ত অংশেই অল্পবিস্তর দংশনদান করা যায়। তবে অন্য বিশারদগণ নির্দেশ দিচ্ছেন যে, ললাট, উপরের ও নীচের ঠোঁট, গণ্ড, গলার পশ্চাদংশ, বুক, স্তন—এই কয়টি স্থান দংশনের সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত। উরুসন্ধিপ্রদেশ, বাহুমূল ও রতিশৈল (জননযন্ত্রের উপরিভাগস্থ লোমশ প্রদেশ)—এই তিনটিও অঞ্চলবিশেষে দশন-বিলেখনের জন্যে ব্যবহৃত করা হয়।

যে দন্ত প্রিয়ার গাত্রচর্ম মনোরমভাবে ছেদের উপযোগী, তার স্বরূপ বর্ণনা কোরেছেন বাৎস্যায়ন। যে দাঁতগুলো এব্‌ড়ো-খেব্‌ড়ো, ছোট-বড়, চিড়্-খাওয়া, তলার দিকে ক্ষয়িষ্ণু, নড়্‌বড়ে, পোকা-খাওয়া, পান্‌সে, অবিন্যস্ত, ফাঁক ফাঁক্ কোরে বসানো এবং তলার দিকে করাতের

মতো কাটা-কাটা, সেগুলো কামজ দংশনের অনুপযুক্ত বোলে বিধান দেওয়া হয়েছে তাঁর বইয়ে।

যাহোক, "কামসূত্রে" আমরা আট রকম দংশনের বিবরণ পাই। একে একে সেগুলো বলি তোমাদের কাছে।—

(১) **গূঢ়ক**। বাইরে থেকে বোঝা যায় না এমনভাবে সন্তর্পণে ও সুকৌশলে যদি একটি বা দুটি দাঁত দিয়ে কোন অঙ্গ আঁচ্‌ড়িয়ে দেওয়া হয়, তাহলে তাকে বলে গূঢ়ক। এটি নীচের ওষ্ঠের ভিতর দিকে প্রদেয়।

(২) **উচ্ছুনক**। গূঢ়ক যখন ঈষৎ বেগের সঙ্গে সম্পাদিত হয় যাতে জায়গাটা একটু ফুলে ওঠে, তখন তাকে বলে উচ্ছুনক। উচ্ছুনক অধর-মধ্যে ও কপালে প্রদান করা বিধি।

(৩) **বিন্দু**। ওপরের ও নীচের পাটির একটি স্বদন্ত (সূচালো কুকুরে দাঁত) অল্প চেপে ধোরে শরীরের কোন অংশে পর পর বিন্দুর আকারে যে চিহ্ন এঁকে দেওয়া হয়, তাকে বলে বিন্দু-দংশন।

(৪) **প্রবালমণি**। যদি উপর-নীচের দুটি কোরে দাঁতের ও দুই ওষ্ঠের মধ্যে কোন স্থান বার বার চেপে ধোরে ও সঙ্গে সঙ্গে চোষণ কোরে সেখানে রক্ত জমিয়ে প্রবালের আকারে ফুলিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে তাকে বলে প্রবালমণি-দংশন। বিন্দু ও প্রবালমণি সাধারণত স্ত্রীলোকের বামগণ্ডে প্রযোজ্য, নতুবা বাম স্কন্ধে বা বক্ষের মাংসল স্থানে।

(৫) **মণিমালা**। যখন প্রবালমণি-দংশন এক দিকের গলমূল থেকে আরম্ভ কোরে মালার আকারে বুকের ওপর দিয়ে অন্য দিকের গলমূল পর্যন্ত সাজিয়ে দেওয়া হয়, তখন তাকে বলে মণিমালা।

(৬) **বিন্দুমালা**। সামনের দিকের ওপর-নীচের প্রতি পাটির চারটি দাঁতকে নিয়োজিত কোরে মালার আকারে যে বিন্দুচিহ্ন অঙ্কিত কোরে দেওয়া হয়, তার নাম বিন্দুমালা। বিন্দুমালা স্ত্রীলোকের বুকে, বগলে ও উরুসন্ধির নিকট সাধারণত প্রযোজ্য।

মেয়েদের ব্যায়াম

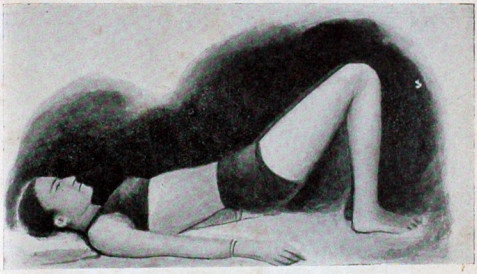

কইব কথা কানে কানে—

কইব কথা কানে কানে—

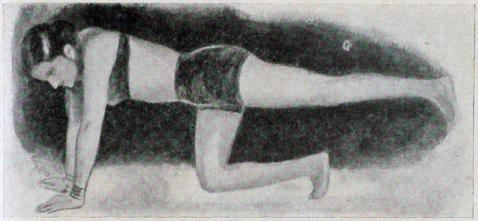

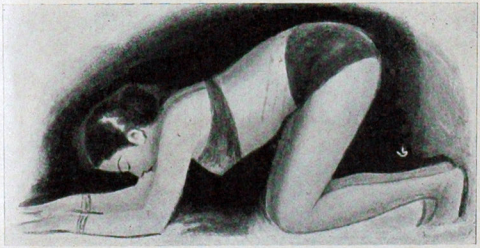

৭

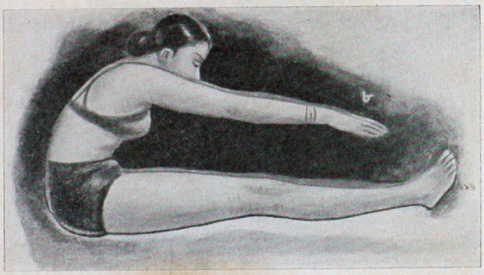
৮

৯

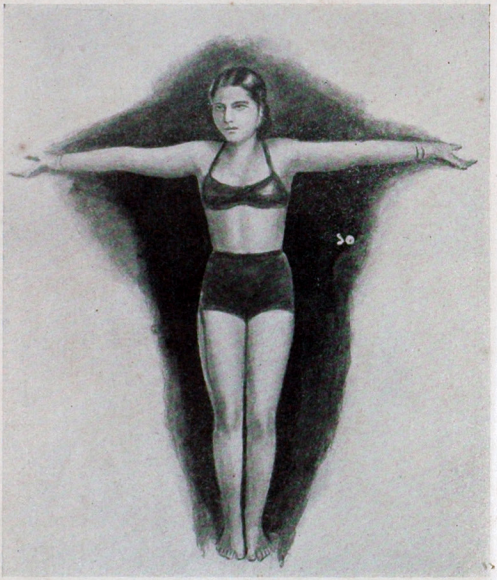

পুরুষদের ব্যায়াম

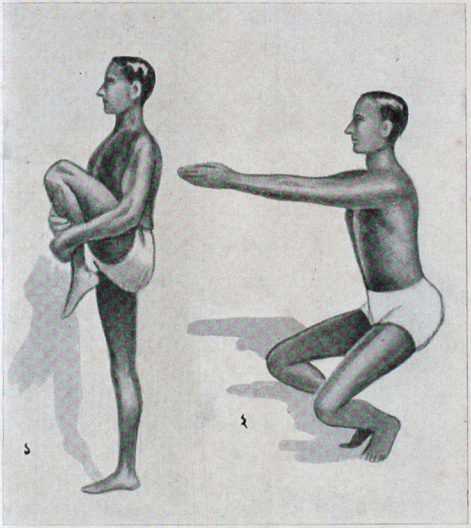

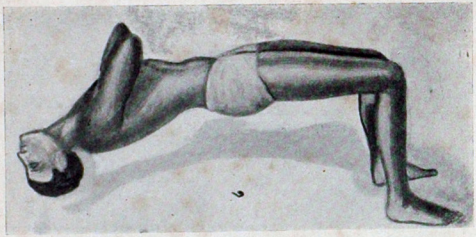

৩

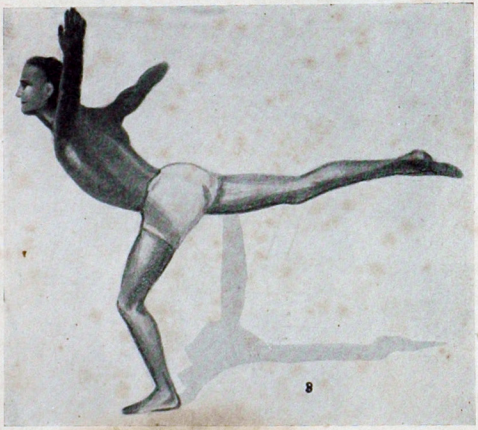

৪

(৭) **খণ্ডাভ্রক**। উপর ও নীচের পাটির যতগুলি সম্ভব দন্তের সাহায্যে কোন মাংসল স্থলের কিয়দংশ মুখমধ্যে গ্রহণ কোরে যে মণ্ডালাকার বা ডিম্বাকৃতি দশনচিহ্ন এঁকে দেওয়া হয়, তাকে বলে খণ্ডাভ্রক। সাধারণত এই রূপ ছেদ স্তনপৃষ্ঠেই প্রদান করা হয়।

(৮) **বরাহচর্বিতক**। উপরের দুইটি ও নীচের দুইটি খদন্ত (কুকুরে দাঁত) দ্বারা স্তনপৃষ্ঠের বা বাহুশীর্ষের মাংসল স্থান অল্প কাম্‌ড়ে ধোরে, জায়গাটাকে অল্পক্ষণ মৃদু চর্বণ কোরে ছেড়ে দিতে হয়; তার পাশে আর একটা জায়গা ঐ রকম কর্তে হয়। এই রকম কোল্লে গাঢ় লালবর্ণের বুটির মতো দাগ পোড়ে যাবে। এই দংশনের নাম বরাহচর্বিতক।

কেশগ্রহণ ও প্রহণন

চুম্বন, দংশন ব্যতীত হিন্দু শাস্ত্রকাররা "কেশগ্রহণ" নামে আর একটি উপাদেয় উপাচারের উদ্ভাবন করেছিলেন। চলিত কথায় একে বলে চুলের আদর। সাধারণত মেয়েরাই পুরুষের চুলের আদর করে। আবার কোন কোন পুরুষও মেয়েদের ললাট-পার্শ্বের চূর্ণকুন্তল নিয়ে আদর করতে ভালবাসে। হিন্দুরা চার রকমের কেশগ্রহণের পরিভাষা দিয়েছেন। এই বইতে সেগুলো আর বিস্তার কোরে বল্‌লুম না।

এ ছাড়া রতিক্রিয়া-কালে করতালুর দ্বারা উভয় তরফ থেকে মৃদু মৃদু টেপা ও আঘাত করার প্রথাও ভারতে এককালে প্রচলিত ছিল। এর নাম "প্রহণন"। পাঁচরকমের প্রহণন বা করাঘাত করা যেত। (১) চপেটাঘাতের কায়দায় করপত্র সোজাসুজি বিস্তার কোরে তাই দিয়ে, (২) করপত্রের উল্টোদিক্ দিয়ে, (৩) করপত্র প্রায় মুষ্টিবদ্ধ কোরে, (৪) আঙুলগুলো প্রায় গায়ে গায়ে লাগিয়ে ও ভেতর দিকে একটু মুড়ে করপত্রটিকে গোখ্‌রো সাপের ফনার মতো কোরে, এবং (৫) দু'হাতের দুই বুড়ো আঙুল, অথবা দুই বুড়ো আঙুল আর দুই তর্জনী দিয়ে।...

শরীরের কোথায় কোথায় প্রহণন দেওয়া যায় এবং কত রকমের প্রহণন আছে, তার লম্বা ফিরিস্তি তোমাদের দেব না। তবে জেনে রেখো, এই সব উপচার রমণের বহিরঙ্গ বিশেষ; এগুলো মুখ্যত পুরুষে ও গৌণত স্ত্রীলোকে অপর পক্ষকে প্রদান কর্লে শুধু আনন্দই নিবিড় হয় না—রতিক্রিয়ার স্থায়িত্ব ও গাঢ়ত্ব বোধ করি বেশ খানিকটা বেড়ে যায়।

সীৎকার

রতিক্রিয়া-কালে প্রায় সকল দেশের অধিকাংশ রমণীই বিভিন্ন প্রকারের স্ফুট বা অস্ফুট শব্দ মুখ দিয়ে বের করে। একে বলে "সীৎকার"। বাৎস্যায়ন বলেন, সীৎকার প্রহণনের ফলস্বরূপ। কিন্তু এ কথা আমরা স্বীকার করতে অপারগ। এগুলো তারা যে ইচ্ছে কোরে বের করে তা নয়, বলবৎ ও বিলম্বিত ক্রিয়া-জনিত সুখের আবেশ-বশে আপনা আপনিই তাদের কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত হয়। এটা যেন তাদের প্রগাঢ় আনন্দঅনুভূতির শব্দিত প্রকাশ। যারা স্বল্প সুখ পায় অথবা কোন সুখই পায় না,—এমন কোনো কোনো কলারসজ্ঞা ও সুচতুরা নারী পুরুষের প্রীতির জন্যে ভান কোরেও সীৎকার করে।

এই বিচিত্র ধ্বনিসমূহ সাধারণত নির্গত হয় পুরুষের বিভিন্ন প্রকারের উপচার-প্রয়োগকালে, শিশ্নাগ্র-দ্বারা অভ্যন্তরভাগে পুনঃপুন আঘাত প্রদান-কালে, স্ত্রীলোক নিজে রতি ব্যাপারে পুরুষানুরূপ চেষ্টাবতী হলে এবং ক্রিয়ার শেষ সময়ে ইতিহর্ষ (orgasm) লাভ কালে। প্রহণনপ্রয়োগ ব্যতীত রতিকালে যে বিভিন্ন অঙ্গচালন-শব্দ ও মুখশব্দ উত্থিত হয়, বাৎস্যায়ন তার নাম দিয়েছেন বিরুত। তিনি আট প্রকার বিরুত ও সাত প্রকার সীৎকারের উল্লেখ কোরেছেন। কিন্তু আমরা সর্বপ্রকার রতিকালীন্ ধ্বনিকেই সীৎকার নামে অভিহিত করতে চাই।

সীৎকারের আমূল তালিকা ও সংজ্ঞা লিপিবদ্ধ কোরে তোমাদের

বিভ্রান্ত করতে চাই না। কেবল এ সম্বন্ধে তোমাদের জ্ঞাতব্য দু-চারটে কথা এখানে বোলে যাব। ঠিক সীৎকার জিনিসটা স্ত্রীলোকের একচেটে হোলেও ক্রিয়াকালে কোন কোন পুরুষও মুখর হয়। এমন পুরুষ আছে, যারা শুক্রনির্গমণ-কালে চাপা বেদনা-ধ্বনি করে, কেউ কেউ এক-একটা অর্থহীন বাণী উচ্চারণ করে, কেউ কেউ হর্ষব্যঞ্জক চীৎকার করে। কেউ-বা ক্ষুদ্র আদরের কথা ছাড়ে অথবা অভব্য গালি পাড়ে; কেউ বা প্রিয়ার হাতে মৃত্যু-ভিক্ষা করে।

মেয়েদের প্রধান পাঁচপ্রকার সীৎকারের নাম উদ্ধার কোরে দিচ্ছি। এ ছাড়া হিন্দুদের বিভিন্ন কামশাস্ত্রে আরো নানা রকমের ধ্বনিঘটিত পরিভাষা আছে।

(১) **হিংকার**। ওষ্ঠবদ্ধ থাকা অবস্থায় নাসানালী ও গলকক্ষের সংযোগস্থল থেকে যে অতি সংক্ষিপ্ত কাটা-কাটাভাবে উঃ-উঃ, হুঁ-হুঁ, হিঁ-হিঁ প্রভৃতি শব্দ নির্গত হয়, তাকে বলে হিংকার।

(২) **স্তনিত**। অতি দূর থেকে আগত মেঘের গুর্‌গুর্ শব্দের মত যে কাটাকাটা শব্দ গলার তলদেশ থেকে উত্থিত হয়, তাকে বলে স্তনিত।

(৩) **সূৎকৃত**। স্ফুরিত নাসিকার ভেতর দিয়ে অথবা ঠোঁট্ দুটো টাকার থলির মুখের মতো গুটিয়ে যখন মুখের ভেতর থেকে সশব্দে তালে তালে একটু একটু হাওয়া ছাড়া হয়, তখন তাকে বলে সূৎকৃত। এ শব্দ অনেকটা গোখরো সাপের ফোঁস ফোঁস্ শব্দের মতো, ধোপা-ধোপানীদের কাপড়-কাচার সময় অপূর্ব হিস্ হিস্ ধ্বনির মতো অথবা জিভের ডগায় জল এলে ক্রমাগত তা গলার ভেতর দিকে টেনে নেবার শব্দের মতো।

(৪) **দূৎকৃত**। জিহ্বাগ্র দ্বারা ওপরের পাটির সাম্‌নের দাঁতগুলির পেছনে অথবা তালুর গায়ে ক্রমাগত দ্রুতলয়ে আঘাত কোরে যে 'ট' বা 'ঠ'এর মতো, টক্কর দেওয়ার মতো, দূরাগত বাঁশ-ফাটা শব্দের মতো শব্দ পুনঃ পুনঃ উত্থিত করা হয়, তাকে বলে দূৎকৃত।

(৫) **রুদিত**। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দের মতো যে অব্যক্ত আওয়াজ বেরোয়, তার নাম রুদিত। "আঃ আঃ", "ওঃ ওঃ", "ইঃ ইঃ" "হোঁ হোঁ" প্রভৃতি বেদনাব্যঞ্জক ধ্বনিও বেরোয়। বাইরে থেকে শুনলে মনে হয় কে যেন অসুখের যাতনায় কাতরাচ্ছে। আবার কান্নার সুরে একাধিক অর্থবোধক শব্দ বা বাক্যাংশও নির্গত হোতে পারে; যথা—ওগো, মাগো, ছাড়, পারি না, সর, থাক্, আর নয়, ভালো লাগে না, কি জ্বালা, সয় না, ম'লুম যে···ইত্যাদি। বলার ভঙ্গী দেখেই বোঝা যায় যে, এগুলোর বিশেষ কোন অর্থই নেই, কেবল ভাবোচ্ছ্বাস-বশে নিঃসৃত হয়। রুদিতের মধ্যে প্রায় ক্ষেত্রেই হয়তো খানিকটা বেদনাবোধ থাকে, খানকটা ভান থাকে, কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই নারবে লুকিয়ে থাকে আমন্ত্রণচর্চিত সুখাবেশ!

পঞ্চম বৈঠক

স্ত্রীপুরুষের শ্রেণীবিভাগ

'রতিরহস্যে'র গ্রন্থকার কোক্কক পণ্ডিত এবং 'অনঙ্গরঙ্গে'র গ্রন্থকার কল্যাণমল্ল ভারতীয় স্ত্রী ও পুরুষ প্রত্যেক সম্প্রদায়কে দৈহিক মিলনের উপযোগিতা ও কামাবেগের তারতম্য বিচার কোরে চার ভাগে বিভক্ত কোরে গেছেন। রূপগুণ, কামাবেগ ও জননযন্ত্রের দৈর্ঘ্যপ্রস্থের বিবেচনায় সর্বোত্তম, উত্তম, মাঝারি ও মন্দ—এই চার রকমের পর্যায়ে সব স্ত্রীপুরুষকে ফেলা হোয়েছে। স্ত্রীলোকের চারটি শ্রেণী হ'ল—(১) পদ্মিনী, (২) চিত্রিণী, (৩) শঙ্খিনী ও (৪) হস্তিনী। পুরুষের চারটি শ্রেণী হ'ল—(১) শশ, (২) মৃগ, (৩) বৃষ ও (৪) অশ্ব।

বলা হয়েছে যে, পদ্মিনীর যোনিনালীর গভীরতা সর্বাপেক্ষা অল্প এবং সেই অনুপাতে শশের সাধনদণ্ড আয়তনে সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র। সুতরাং এই দুই শ্রেণীভুক্ত স্ত্রীপুরুষের মিলন অত্যন্ত সুখাবহ ও বাঞ্ছনীয়। আবার হস্তিনীর যোনিনালীর গভীরতা সর্বাপেক্ষা অধিক, তদনুপাতে অশ্বের সাধনদণ্ডের আয়তন সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। সুতরাং কথিত হয়েছে, এই শ্রেণীভুক্ত স্ত্রীপুরুষের মিলন-সাধন যেমন রম্য, তেমনি কাম্য।··

শ্রেণীবিভাগের অসম্পূর্ণতা

এ বিভাগ যে কিন্তু খুব স্থূল রকমের হোয়েছে এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে গঠিত হয়নি—সে কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। তাঁরা প্রত্যেক বিভাগের পুরুষ বা নারীর যে সব গাত্রবর্ণ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বৈশিষ্ট্য ও গুণের লক্ষণ দিয়েছেন, সে সমস্ত এখনকার পুরুষ বা নারীর অনেকেরই মধ্যে রকম বারো আনাও মিলিয়ে পাওয়া যায় না। তা ছাড়া

বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিচার কোরে বিভাগ করতে গেলে ব্যাপক অনুসন্ধানের প্রয়োজন হয়; সর্বজাতির সর্বস্তরের সর্ববয়সী নরনারীর দৈহিক বৈশিষ্ট্য ও মানসিক বৃত্তিগুলি বিস্তৃতভাবে পর্যবেক্ষণ কোরতে হয়; এবং প্রত্যেক পরিমণ্ডলের একাধিক নরনারীর কামজীবনের নিগূঢ় ইতিহাস সংগ্রহ কোর্‌তে হয়। এ কাজ একার পক্ষে সম্ভবপর নয় এবং দু'দিনেও সম্পাদ্য নয়।

সে যুগে সারা ভারতবর্ষের সমস্ত স্থান সমস্ত অঞ্চল বেড়াতে গেলে এবং সকল জাতি, উপজাতি ও সম্প্রদায়ের জীবন-ধারা ভালো কোরে অধ্যয়ন কর্‌তে গেলে একটা লোকের গড়্‌পড়তা আয়ুষ্কালও যথেষ্ট হোত না। একজন অতিশয় মেধাবী বহুদর্শী লোকের পক্ষেও বিভিন্ন প্রদেশে কয়েক সহস্র বা কয়েক শত পুরুষলোকের রূপগুণের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য কোরে এবং তাদের লিঙ্গের পরিমাপ ও কামাবেগের পরিমাণ নির্ধারণ কোরে প্রণালীবদ্ধ ও সুবিন্যস্তভাবে সেগুলো লিপিবদ্ধ করা একপ্রকার দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল। এইভাবে সে যুগের মেয়েদের পুনঃপুন পরীক্ষা বা অধ্যয়ন করা পাকা বৈদ্যদেরও কল্পনার অতীত ছিল। হয় কোক্কক-কল্যাণমল্ল শ্রেণীর পণ্ডিতরা নিজের গ্রামের ও নিকটবর্তী নগরের মুষ্টিমেয় পুরুষকে একটু ঘনিষ্ঠভাবে ও জন কয়েক নারীকে ভাসাভাসাভাবে কিছুকাল পর্যবেক্ষণ কোরেই তাঁদের মনোহর থিওরি খাড়া কোরেছেন; নতুবা নিজ বান্ধব ও আত্মীয়কুটুম্বদের দু'চার জনকে দেখেশুনে এবং তাদের কাছ থেকে সংগৃহীত সীমাবদ্ধ, অতিশয়োক্ত অভিজ্ঞতা ও স্বল্প জ্ঞানের ওপর রঙ চড়িয়ে এই কাণ্ডটি কোরে বোসেছেন।

ঐ শ্রেণীবিভাগ অতি পুরাতন ও লৌকিক

বাৎস্যায়ন মুনি এঁদের অনেক পূর্ববর্তী কালের লোক এবং এঁদের বিজ্ঞতার পথপ্রদর্শক। তিনি নিজে স্ত্রী ও পুরুষের তিনটি কোরে বিভাগকে স্বতঃসিদ্ধ সত্য বোলে মেনে নিয়েছেন, যদিও স্ত্রীপুরুষের রূপ-গুণ-

লৈঙ্গপ্রকৃতিগত এই কয়টি ধরাবাঁধা শ্রেণীর ওপর বেশী আস্থা স্থাপন করেন নি। তাঁর 'কামসূত্র' পড়লে জানা যায় যে, তাঁর আগে থেকেই স্ত্রীপুরুষের কতকটা এই ধরণের একটি বিভাগ লোক-সমাজে প্রচলিত ছিল। সুতরাং এই বিভাগকে নির্ভুল, বিজ্ঞানসম্মত ও নির্ভরযোগ্য আদর্শ বোলে গ্রহণ না কোরে, অতি প্রাচীন কালে ভারতে এইভাবে স্ত্রীপুরুষের যে একটা মোটামুটি রকমের শ্রেণীবিভাগের চেষ্টা হয়েছিল শুধু সেই চেষ্টাকেই প্রশংসা করা উচিত, এবং তাতে কিছু গর্ব অনুভব কর্লেও দোষাবহ হবে না। আজকাল শুধু অর্ধশিক্ষিত গ্রাম্য লোকের মধ্যে নয়, শিক্ষিত নরনারী-সমাজেও এই বিভাগকে কতকটা অভ্রান্ত ও প্রামাণিক জ্ঞান কোরে নিজেদের আশেপাশের স্ত্রীপুরুষদের এক-একটা পরিভাষার আওতায় ফেল্‌বার সস্তা প্রয়াস চলে। অনেক বাড়ির গিন্নির মুখে হয়তো তোমরা এই রকম একটা উপমামূলক মন্তব্য শুন্‌তে পাবে—"বাবা, মেয়ে যেন শঙ্খিনী!" "ওদের বাড়ির বউটা যেন হস্তিনী!"

যোনিনালীর পরিমাপ

পদ্মিনী, শঙ্খিনী প্রভৃতি নারীর এবং শশ, মৃগ প্রভৃতি নরের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, ওই বর্ণনার সঙ্গে হুবহু মেলে এমন নারী বা নর এযুগে আমাদের দেশে প্রায় দুর্লভ; এবং এরা কোন যুগেই বোধ হয় সুলভ ছিল না। অবশ্য এই বর্ণনার সঙ্গে মোটামুটি চোদ্দ আনা কি বারো আনা মেলে এমন নারী সে যুগেও যেমন পাওয়া যেত, এ যুগেও হয়তো তেমনি পাওয়া যায়। কিন্তু পদ্মিনী শ্রেণীর নারীর যোনিনালীর যে মাপ দেওয়া হয়েছে, শুধু ভারতবর্ষীয়া নয় জগতের প্রায় সর্বজাতীয়া নারীরই যোনি-নালীর মাপ তার চেয়ে বড় তো নয়ই, বরং কিছু ছোট। পদ্মিনীর যোনিনালীর মাপ দেওয়া হয়েচে ৪½ ইঞ্চি (৬ অঙ্গুলি), চিত্রিণীর ৬ ইঞ্চি, শঙ্খিনীর ৭½ ইঞ্চি ও হস্তিনীর ৯ ইঞ্চি। কোক্কক পণ্ডিতের এই পরিমাপের হিসাব যেমন খেয়ালপ্রসূত তেমনি অবিশ্বাস্য। নিগ্রো, ইহুদি

ও ওলন্দাজ রমণীদের গড়পড়তা মাপ ৩⅝″ থেকে ৪″; কচিৎ কারো ৪½″ বা ৪½″ দেখা যায়। জগতের অন্যান্য জাতের রমণীদের ৩″ থেকে ৩½″। ৬″ থেকে ৯″ পর্যন্ত গভীর যোনিনালী-সমন্বিত নারী জগতে এ পর্যন্ত একটাও দেখা যায় নি। এমন কি ৫॥″ গভীর যোনিনালীর সন্ধান পাওয়া গিয়েছে কি না তা' বহু কেতাব ঘেঁটেও জানতে পারিনি।

এদেশে ও অন্যান্য দেশের প্রসূতি-হাসপাতালে লক্ষ লক্ষ প্রসূতি প্রসব করাতে আসে; বহু নারী জননযন্ত্রঘটিত ব্যাধির চিকিৎসাপ্রার্থিনী হোয়েও আসে। ধাত্রী ও লেডিডাক্তাররাও লক্ষ লক্ষ প্রসূতিদের বাড়িতে গিয়ে খালাস কোরে আসেন। এক লক্ষের ভেতর নিরনব্বই হাজার ন শো নিরনব্বই জন স্ত্রীলোকেরই যোনিনালীর প্রায় শেষপ্রান্ত পর্যন্ত ধাত্রী ও চিকিৎসকগণ নিজেদের তর্জনী বা মধ্যমাঙ্গুলি দিয়ে অনুভব কর্‌তে পারেন। এমন কি, শয়নের একটি বিশেষ ভঙ্গীতে আঙ্গুলের ডগা দিয়ে জরায়ুর মুখ সহজে টের পাওয়া যায়।

তোমাদের মধ্যে যারা একেবারে অজ্ঞ, তাদের এইখানে আর একটি তথ্য জানিয়ে দিই যে, প্রত্যেক রমণীই যোনিনালীর শেষ প্রান্ত চওড়া হোয়ে অনেকটা টর্চ-লাইটের মাথার মতো হোয়ে থাকে। এই প্রান্তটা অবশ্য তিন দিকেই পেশীর দেওয়াল দিয়ে আঁটা—তলপেটের বা পেটের অন্য কোন যন্ত্রের সঙ্গে কোন যোগাযোগই নেই। এর মাঝখানে জরায়ুর গলা আর মুখটুকু গুটোনো ঠোঁটের মতো শক্ত হোয়ে বেরিয়ে রয়েচে। তার ফলে যোনিনালীর শেষ দিকে দু'টি খাঁজ বা পকেটের সৃষ্টি হোয়েছে। সম্মুখভাগে বা তলপেটের দিকে যে পকেট সেটা অপেক্ষাকৃত ছোট, আর পশ্চাদ্‌ভাগে বা পিঠের দিকে (বা মলকোষ্ঠের দিকে) যে পকেট, সেটা আয়তনে একটু বড় ও গভীর। রতিক্রিয়া-কালে পুরুষাঙ্গের শীর্ষদেশ সচরাচর এই পিছনের খাঁজের মধ্যেই পুনঃ পুনঃ গতায়াত করতে থাকে।...

আর একটা কথা মনে রেখো। সন্তান-জনন হ'লে প্রত্যেক নারীরই যোনিনালীর দৈর্ঘ্য কিছু কমে এবং প্রসারতা অল্পবিস্তর বৃদ্ধি পায়।...

পুরুষাঙ্গের পরিমাপ

এখন পুরুষদের সাধনদণ্ডের সাধারণ আয়তন সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক। কোক্কক ও কল্যাণমল্ল শশ-শ্রেণীর ধ্বজের লম্ব নির্ধারণ করেছেন ৪½ ইঞ্চি, মৃগের ৬″, বৃষের ৭½″ এবং অশ্বের ৯″। অর্থাৎ উভয় পক্ষের পরিমাপটা এমনভাবে নির্ধারণ কোরে দিয়েছেন, যাতে কোরে পদ্মিনীর যোনিনালীর মধ্যে শশের ধ্বজ, চিত্রিণীর নালীমধ্যে মৃগের ধ্বজ, শঙ্খিনীর নালীমধ্যে বৃষের ধ্বজ এবং হস্তিনীর নালীমধ্যে অশ্বের ধ্বজ অনায়াসে বা অল্পায়াসে অনুপ্রবেশ কর্‌তে পারে এবং উভয়ের সম্মিলন সর্বাপেক্ষা সমঞ্জস, উপভোগ্য ও সুখসাধ্য হয়।

কিন্তু তোমরা স্ত্রীনালীর পরিমাপ সম্বন্ধে যেমন জান্‌তে পেরেছ যে, অতিবড় নালীর গভীরতা কখনো ৪ ইঞ্চির বেশী হয় না, তেমনি জেনে রাখ যে, সাধারণত অতিবড় পুরুষাঙ্গের কঠিন অবস্থায় দৈর্ঘ্য ৬ ইঞ্চির বেশী হয় না। জগতের অধিকাংশ প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের উচ্ছ্রিত লিঙ্গের গড়্‌পড়্‌তা পরিমাপ ৫″ থেকে ৫½″ মাত্র। সুতরাং প্রাচীন বিশারদগণের পুরুষাঙ্গের পরিমাপ-ভেদে শ্রেণীবিভাগকেও সর্বতোভাবে অবিশ্বাস করা ছাড়া আর উপায় নেই। উদ্দীপ্ত অবস্থায় ৮½″ থেকে ৯″ দৈর্ঘ্যের লিঙ্গ গত কয়েক শত বছরের মধ্যে চিকিৎসকদের নজরে গুটি কয়েক মাত্র এসেছে; এবং এ গুলিকে চিকিৎসকরা শুধু অসাধারণ বলেন নি, প্রকৃতির অসম্ভব খেয়াল ও নারী-সম্ভোগের সম্পূর্ণ অনুপযোগী বোলে মন্তব্য কোরেছেন।

আমাদের দেশে বহু প্রাপ্তবয়স্ক লোকের সন্ধান পাওয়া যায় যাদের লিঙ্গ উচ্ছ্রিত অবস্থায় ৩″ থেকে ৩½″ ইঞ্চির বেশী দীর্ঘ নয় এবং মূল-

দেশের বেড় ৩" থেকে ৩½" ইঞ্চির অনধিক। এরা অবশ্য আমাদের খানিকটা সমবেদনার পাত্র। এরা বিবাহের অব্যবহিত পরে দিন কয়েক সম্প্রয়োগ-কালে আপন স্ত্রীদের সর্বাপেক্ষা কম বেদনা দেয় সত্যি, কিন্তু তারপর ক্রমশ স্ত্রীরা যখন কামাবেগশালিনী ও যৌনরসজ্ঞা হোয়ে ওঠে, তখন স্বামীর ন্যূনতা একটু একটু কোরে উপলব্ধি করে। শেষে কামজীবনারম্ভের দুই-এক বৎসর পরে অথবা একটি সন্তানপ্রসবের পর এই অসুবিধা তাদের পক্ষে অল্পবিস্তর মর্মপীড়াদায়ক হয়।

তবে যদি পত্নী স্বভাবত অল্প কামাবেগযুক্তা এবং অত্যন্ত স্বামি-সোহাগিনী হয়, তাহলে স্বামীর এই প্রকৃতিদত্ত ত্রুটিকে তিতিক্ষার চক্ষে দেখতে শেখে। অন্যদিকে স্বামী যদি একটু অধিকক্ষণ বীর্যধারণক্ষম হয় এবং স্ত্রীকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইতিহর্ষ-লাভের সুযোগ প্রদান করে, তাহলে তাদের আর কোন ক্ষোভেরই কারণ থাকে না। অপর পক্ষে, স্বামী যদি স্বাভাবিক অথবা স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেশী আয়তনযুক্ত পুরুষাঙ্গের অধিকারী হোয়েও অতিশীঘ্র স্খলন করে, তাহলে প্রায় সর্ব শ্রেণীর স্ত্রীলোকের কাছেই সেটা ঘোর অসুবিধাজনক ও অসন্তুষ্টিকর হয়। একমাত্র লৈঙ্গিক খর্বতা ও রমণ-ন্যূনতায় অনেক সংসারে প্রকাশ্যে ও গোপনে অনেক ব্যাধি, মনোভঙ্গ, বিদ্রোহ, বৈরাগ্য ও শান্তিনাশ ঘটে।

কোন্ আকারের সাধনদণ্ড কাম্য

এখন তোমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, কিরূপ আকারের পুরুষাঙ্গ গড়্‌পড়তা সুস্থ স্বাভাবিক স্ত্রীলোকের কাছে হৃদ্য ও সুখকর হোতে পারে। এর উত্তর দেওয়া যত সহজ ভাব্‌ছ, তত সহজ নয়। তবে যখন 'গড়্‌পড়তা' শব্দটা ব্যবহার করেছ, তখন আমিও উত্তরে গড়্‌পড়তা হিসেবটা দিই। কিন্তু তার আগে আর একটা তথ্য তোমাদের জেনে রাখা দরকার,—সেটা এই প্রশ্নের উত্তরের একটা অচ্ছেদ্য

অংশ বোলে ধোরে নিতে পার। সেটা হল এই যে, প্রাথমিক পুরুষাসঙ্গের অনিবার্য ক্লেশের ক্রম কাটিয়ে ওঠার পর প্রত্যেক রমণীর পক্ষেই সুবিধাজনক ও প্রীতিকর হয় অল্প স্থূল ও একটু অধিক লম্বা দণ্ড; মধ্যবয়সে (যৌবনের শেষে ও প্রৌঢ়ত্বের প্রথমে) প্রীতিকর হয় একটু অধিক স্থূল ও অধিক লম্বা ধ্বজ; শেষ বয়সে (প্রৌঢ়ত্বের অবশিষ্টাংশে ও বার্ধক্যের প্রথমাংশে) প্রিয় হয় রীতিমতো স্থূল ও অপেক্ষাকৃত হ্রস্ব ধ্বজ। কিন্তু একজন পুরুষের বয়সের সঙ্গে তার পুরুষাঙ্গের উপরোক্তরূপ পরিবর্তন হওয়া সম্ভব নয়। প্রৌঢ়ত্বের মধ্যে বা বার্ধক্যের প্রথমাংশে কারো লিঙ্গের স্থূলতা অবশ্যই বাড়ে না, বরং দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ অল্পবিস্তর কোমেই যায়।

গড়্‌পড়তা রমণীর সর্ববয়সেই মোটামুটি প্রীতিপ্রদ লিঙ্গ কোন্ ধরণের হবে—তার উত্তরে বল্‌তে চাই যে, যে লিঙ্গ দৃঢ়াবস্থায় ৪॥৫ ইঞ্চির কম নয়, ৫॥ ইঞ্চির বেশী নয়, যা মূলদেশে হবে একটু স্থূল—অগ্রভাগে হবে একটু সরু, মূলদেশে যার বেড়্ হবে মোটামুটি ৪॥ ইঞ্চি এবং এবং অগ্রভাগে যার বেড়্ হবে ৪ ইঞ্চি থেকে ৪। ইঞ্চির মধ্যে। [মনে রেখো, আমাদের দেশের দোহারা লোকের চওড়া দিকের দু আঙুলের মাপ অল্পাধিক ১½ ইঞ্চির সমান, ডগার দিকে প্রায় ১¾"।]

সাধন-সম্বাধে মিলন কি কোরে সম্ভব

এখন আমার স্ত্রী-পুরুষ উভয় শ্রেণীর শ্রোতাই আমাকে উৎসুক হোয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌ছ—যোনিনালীর দৈর্ঘ্য যদি ৩½" ইঞ্চির বেশী স্বভাবত না হয় এবং পুরুষের ইন্দ্রিয় যদি উদ্রিক্ত অবস্থায় স্বভাবত ৫½ ইঞ্চি পর্যন্ত দীর্ঘ হয়, তাহলে গড়্‌পড়তা প্রাপ্তবয়স্কা নারীর সম্বাধে পূর্ণ প্রবেশ করানো কি কোরে সম্ভবপর হয়? সকলেরই মনে এ প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। পূর্ণপ্রবেশের বোধ থেকেই এখনো অনেক প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ মনে করেন যে, পুরুষের ধ্বজ আমূল যখন প্রবেশ কর্‌তে পারে, তখন

গড়্‌পড়্‌তা রমণীর যোনিনালীর গভীরতা ৫½ ইঞ্চির কম কিছুতেই নয়। ভুল ধারণা এটা।...তবে কি কোরে সম্ভব হয়? এক কথায় এর উত্তর দিতে গেলে বলতে হয় যে, গড়্‌পড়্‌তা যুবতী বা প্রৌঢ়া নারীর নালীর গভীরতা ৩ থেকে ৩½ ইঞ্চির বেশী না হলেও কার্যকালে ওর গভীরতা বেড়ে যায়—প্রায় দেড়া হোয়ে যায়। এইবার সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বলি, মন দিয়ে শোন।...

যোনিনালীর মুখ বা যোনিদ্বার বল্‌তে আমরা যা বুঝি, তার বাইরেও কতকগুলো জিনিস আছে যাতে আসল নালীর গভীরতার আধিক্য সম্বন্ধে ভ্রম জন্মায়। এই বাহ্যিক জিনিসগুলোর মধ্যে হচ্ছে "গুরু ভগাধর" ও "লঘু ভগাধর" নামক লম্বালম্বি অবস্থিত ঠোঁটের মতে এক জোড়া কোরে পুরু মাংসল অংশ। তা'ছাড়া, তোমরা যারা আমার অন্যান্য বই পড়েছ তারা সকলেই জানো যে, শৈশব থেকেই মেয়েদের নালীমুখের কাছে পাৎলা পর্দা দিয়ে নালীর অবশিষ্টাংশ প্রায়-সবটা ঢাকা থাকে; প্রথম সহবাসের ফলে তো বটেই, তা ছাড়া অন্যান্য কারণেও ওই পর্দাটা ছিঁড়ে যেতে পারে। পর্দাটা ছিঁড়ে যাবার পর ওর পুরু মূলদেশের কতকাংশ গুটিয়ে শুকিয়ে একটা ছোট্ট ঢিবির মতো দ্বারের নীচের দিকে চিরকাল বেরিয়ে থাকে। তাছাড়া দ্বারের মাথার দিকে "ভগালিন্দ" (Vestibule) নামে একটা ত্রিকোণাকার অগভীর জায়গা আছে, দু'পাশে ছোট পেঁয়াজের কোয়ার মতো দুটো ছোট পিণ্ড বসানো আছে। এই সব পেরিয়ে তবে আসল নালীর মুখ পাওয়া যায়।

কিশোরীদের, যুবতীদের, বন্ধ্যাদের এবং যাদের ২।১টি মাত্র ছেলেপুলে হয়েছে এমন প্রৌঢ়াদের নালীর গোড়ার দিকে বেশ খানিকটা দেওয়াল কোঁচ্‌কানো থাকে এবং পর-পর বিন্যস্ত ছোট ছোট বালার মতো খাঁজ-কাটা বোলে মনে হয়। স্ত্রীলোক যখন কামাবিষ্টা ও উত্তপ্তা হয়, তখন এই জায়গার দেওয়ালে প্রচুর রক্তস্রোত সজোরে যাতায়াত

করার ফলে ঐ কোঁচ্‌কানো জায়গাগুলো বা খাঁজগুলো জাপানী ফানুসের মতো একটু বিস্তৃত হোয়ে যায়। তাতে নালীর দৈর্ঘ্য কিছু বেড়ে যায়। অবশেষে প্রবিশ্যমান পুরুষাঙ্গের সঞ্চাপ পেয়ে নালীর সমস্ত গুটোনো অংশ টান্‌টান্ হোয়ে গিয়ে ওর গভীরতা পূর্বাপেক্ষা আরো বাড়িয়ে দেয়।

তোমাদের আগেই বলেছি যে, যোনিনালীর শেষপ্রান্ত অপেক্ষাকৃত চওড়া এবং ওখানে জরায়ুর গলাসমেত মুখটা থাকায় ওপরে-নীচে কিংবা সাম্‌নে-পেছনে দুটো ছোট-বড় পকেটের সৃষ্টি হয়েছে। সহবাস-কালে সাধারণত তলার অর্থাৎ পিঠের দিক্‌কার অপেক্ষাকৃত লম্বা-চওড়া খাঁজটার মধ্যে পুরুষের সাধনদণ্ড এসে পুনঃপুন প্রবেশ ও আঘাত করতে থাকে। ঐ সময় এই পকেটের তলাকার ও চারপাশের গুটোনো দেওয়াল্ পুরুষাঙ্গের চাপ পেয়ে দৈর্ঘ্যেপ্রস্থে যৎসামান্য বেড়ে যায়। এই সব সাময়িক পরিবর্তনের ফলে ৫½" আন্দাজ লম্বা ধ্বজ প্রাপ্তবয়স্কা নারী সহজে বা অনায়াসে গ্রহণ করতে পারে।...আবার সাম্‌নের দিক্‌কার অপেক্ষাকৃত ছোট পকেটের মধ্যে ধ্বজ প্রবেশ কর্লে ও ওখানকার আয়তন খানিকটা বেড়ে যায়। অবশ্য ৫ ইঞ্চির বেশী লম্বা সাধনদণ্ড এই পকেটটায় প্রবেশ কোরে সঞ্চাপ দিলে তা' প্রায় রমণীর নিকট একটু কষ্টকর হয়। কারণ, নীচের পকেটের চেয়ে উপরের পকেট আধ ইঞ্চিটাক্ ছোট।

তোমরা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পেরেছ যে, যোনিনালীর আগাগোড়া দেওয়ালের মাংস ও চামড়া মোজা বা গার্টারের মতো খানিকটা টেনে দৈর্ঘ্যেপ্রস্থে বাড়ানো যায়। স্ত্রীলোকের যে সাধারণ শয়নভঙ্গীতে সহবাস করা হয়, তাতে কোন উচ্ছ্রিত পুরুষাঙ্গকে প্রতীয়মানত আমূল প্রবেশ করানো হোলেও আসল নালীর বাইরে ওটা কমবেশী প্রায় ১½ ইঞ্চি থেকে যায়; তাছাড়া আসল নালীর আগাগোড়া সামনের দিকে প্রায় এক ইঞ্চি ও শেষের দিকে প্রায় আধ থেকে এক ইঞ্চি পর্যন্ত বেড়ে যায়। কাজেই হিসেব কোরে দেখা যাচ্ছে যে, প্রাপ্তবয়স্কা নারীর

নালীমধ্যে ৫ থেকে ৫½ ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের সাধনদণ্ড অল্পায়াসে সন্নিবিষ্ট করা সম্ভবপর। ৫½ ইঞ্চির চেয়ে কিছু বেশী ও ৬ ইঞ্চির অনধিক দীর্ঘ সাধনদণ্ড বহুদিন পর্যন্ত বহু রমণীর পক্ষে অল্পবিস্তর কষ্টসাধ্য হয়। ৬ ইঞ্চির বেশী লম্বা ও অগ্রভাগের বেড় ৫ ইঞ্চি বা তার বেশী হলে অনেকের পক্ষেই তা একপ্রকার দুঃসহ হয়। তজ্জন্য অনেক নারীই জরায়ুর স্থানচ্যুতি, জরায়ুওষ্ঠের প্রদাহ বা ছোড়ে-যাওয়া অবস্থা, কষ্টরজ, প্রদর, তলপেটে বেদনা, কোষ্ঠ বদ্ধতা প্রভৃতি নানাবিধ ব্যায়রামে ভোগে।

নারীর সহনক্ষমতার সীমা

স্ত্রীপুরুষের কষ্ট সহ্য করার শক্তি সমান নয় এবং রকমারি কষ্ট সহ্য করাও প্রত্যেকের অভ্যাস ও ইচ্ছাশক্তির ওপর নির্ভর করে। মেয়ে জাতির মধ্যেই ঈশ্বর দৈহিক কষ্ট সহ্য করার শক্তি পুরুষের চেয়ে একটু বেশী দিয়েছেন। তার ওপর অল্পবিস্তর দৈহিক বেদনার মধ্য দিয়ে আনন্দরস টেনে বার করবার ক্ষমতা সব মেয়েরই দেহ ও মনে নিহিত থাকে। অবশ্য যার সঙ্গে মনের মিল হয় এবং যাকে তারা ভালবাসে, আঘাতটা তার কাছ থেকে আসা চাই। এবং এই আঘাতদানটা অপর-পক্ষের আনন্দানুভূতির নিমিত্ত অনিবার্য ও অবশ্যকৃত্য—এই সংবিদ্‌ও জাগ্রৎ থাকা চাই। নইলে কিন্তু অল্প আঘাতের বিরুদ্ধেই তাদের দেহমন বিদ্রোহ করে।

তার ওপর আর একটা বিষয় আমাদের বিবেচনার আমলে আনা দরকার। সব মেয়ের সহ্যগুণ সমান নয় এবং সেটা শুধু তাদের মনের ওপর নয়—বংশগুণ, দৈহিক স্বাস্থ্য ও গঠনভঙ্গীর ওপরও অনেকখানি নির্ভর করে। সর্বোপরি অভ্যাসযোগ তো আছেই। সুতরাং জেনে রাখো, কোন কোন পূর্ণকিশোরী বা ভরা যুবতীর এমন দৈহিক গঠন আছে যারা বিয়ের পর বেশ কিছুদিন পর্যন্ত পাঁচ ইঞ্চি বা তার অল্পাধিক দীর্ঘ ও ৪½" মূলদেশযুক্ত দণ্ড সন্নিবিষ্ট করাতে রীতিমতো কাতর হয়। ভালবাসা

নিবিড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এবং একটি সন্তান হওয়ার পর অথবা বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের এই যন্ত্রণা-বোধ অনেকখানি লঘু হয়।

আবার এমন দৈহিক গঠনযুক্তা রমণী আছে যারা পাঁচ ইঞ্চি দীর্ঘ ও মূলদেশে ৪ ইঞ্চি স্থূল ধ্বজ-সন্নিবেশে সমপরিমাণ অথবা কিছু বেশী পরিমাণ যন্ত্রণা ভোগ করে।...তবে এটা স্থির জেনো যে, গড়্‌পড়্‌তা ভারতীয় স্ত্রীলোকগণের পক্ষে ৫½ ইঞ্চির চেয়ে দীর্ঘ দণ্ড অল্পবিস্তর অসুবিধাজনক ও বেদনাদায়ক—এমন কি ২।৩ টি সন্তান-প্রসবের পরেও। অবশ্য দীর্ঘকাল অভ্যাস ও প্রেমবোধের প্রগাঢ়তার সঙ্গে এই অসুবিধাবোধ খানিকটা প্রশমিত হোতে পারে; অথবা গভীর ভালবাসার ফলে ও প্রচুর কামোত্তেজনার ফলে তজ্জনিত বেদনাবোধ অনেকটা সহনীয় হোতে পারে।

বরাঙ্গের স্থিতিস্থাপকতা

ভারতীয় তথা বাঙালী নারীদের গোপনাঙ্গের বাহ্যাকৃতিতে যদি-বা কিছু কিছু পার্থক্য দেখা যায়, তবুও পুরুষের সাধনদণ্ডের দৈর্ঘ্যপ্রস্থ ও গঠনভঙ্গীর মধ্যে যে রকম বিচিত্র পার্থক্য দেখা যায়, নারীর ঐ স্থানের আভ্যন্তরিক গঠনে ঠিক ততখানি দেখা যায় না। নালীর দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে তোমরা জান্‌তে পাল্লে যে, বিভিন্ন নারীর মধ্যে বড় জোর আধ ইঞ্চির পার্থক্য থাকতে পারে এবং এই দৈর্ঘ্য বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বা অধিক সন্তানসন্ততি হওয়ার ফলে মোটেই বাড়ে না, বরং যৎসামান্য কমে। প্রথমবয়সে বিভিন্না নারীর নালীর প্রসারতার মধ্যেও পার্থক্য কম থাকে—যদিও বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, সহবাসের পৌনঃপুনিকতার সঙ্গে সঙ্গে এবং সন্তানপ্রসবের সঙ্গে সঙ্গে প্রসারতা বিভিন্ন নারীতে বিভিন্ন হারে বেড়ে যায়।

আগেই বলেছি যে, যোনিপ্রদেশীয় মাংসপেশীর মধ্যে রবারের মতো খানিকটা স্থিতিস্থাপকতা বা সঙ্কোচন-প্রসারণশীলতা-গুণ সন্নিবিষ্ট থাকে।

অবশ্য এ গুণ স্বভাবত সকল নারীর মধ্যে সমান পরিমাণে থাকে না এবং সেই গুণ অক্ষুণ্ণ রাখার সহজাত ক্ষমতা সকলের সমান নয়। কোন নারী একটি সন্তান প্রসবের পর অথবা দুই-তিন বৎসর সক্রিয় কাম-জীবন যাপন করার পর তার স্থিতিস্থাপকতা-গুণ যতটুকু হারায় অথবা ওর প্রসারতা যতটুকু বাড়ায়, ঠিক ঐ অবস্থার আর একজন নারী ততখানি না হারাতে বা না বাড়াতে পারে। দৈহিক ধাতুপ্রকৃতির বশে কোন কোন যুবতী যেমন তাড়াতাড়ি তার যৌবনের আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্যগুলি হারাতে পারে, তেমনি তার যোনিদেশীয় মাংসপেশীসমূহের সংকোচনপ্রসারণের ক্ষমতাও হারাতে পারে।

প্রসবের পর ও কঠিন অসুখের পর এবং ঋতুস্রাবের সময় সকল নারীরই নালীর প্রসারতা অস্থায়িভাবে কিছু বেড়ে যায়। বংশগত ধাতু-প্রকৃতি-প্রাপ্তির ফলে এক এক একজন প্রৌঢ়া নারীর অথবা চার-পাঁচটি সন্তানের মাতার স্তন যেমন প্রথমযৌবনের মতো স্তব্ধ থাকতে, তেমনি তাঁর নালীর স্থিতিস্থাপকতা-গুণও প্রায় পূর্ববৎ বজায় থাকতে দেখা যায়। তারপর এক একজন নারী অল্পাধিক চেষ্টা ও অভ্যাসের দ্বারা নালী-অভ্যন্তরভাগের পেশীগুলিকে প্রিয়সম্মিলনকালে ইচ্ছা কোরে বেশ খানিকটা সংকুচিত করতেও পারে।···এমন কি কোনো কোনো কেলিকলারসিকা বামা ঐ স্থানের চক্রাকার পেশীতন্তুর দ্বারা শিশ্নমুণ্ডকে সজোরে চেপে ধরার কৌশল জানে।···এই তথ্যগুলি তোমরা বিশেষভাবে মনে রেখো।

শ্রেণীবিভাগের অসারতা

ভারতবর্ষে আবহমানকাল মেয়ে ও পুরুষদের তিনটি বা চারটি শ্রেণীবিভাগের যে ধারণা প্রচলিত রয়েচে, সেটা যে একবারেই অভ্রান্ত নয়—তা এখন তোমাদের বিশ্বাস করতে বোধহয় আপত্তি নেই। পদ্মিনী জাতীয়া স্ত্রীলোককে পণ্ডিতগণ সর্বগুণসম্পন্না, লক্ষ্মীমতী, শ্রেষ্ঠা

সতী এবং তার শরীরের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিখুঁৎ বোলে বর্ণনা করেছেন। পদ্মিনীকে বলা হয়েছে মাঝামাঝি উচ্চতাসম্পন্না; কৃশাঙ্গী দেখালেও দোহারা গড়ন। তার গাত্রবর্ণ গোলাপী, নতুবা চাঁপা ফুলের মতো। চিত্রিণীদেরও আকৃতি প্রায় পদ্মিনীদের মতো বোলে ব্যাখ্যা করা হোয়েছে। এই রকমের মাঝারি আকারের দোহারা চেহারার কোন স্ত্রীলোকের যদি রঙ্ শ্যাম অথবা কৃষ্ণ হয়, তাহোলে সে যে পদ্মিনীর মতো গুণসম্পন্না হবে না—এ কথা ভাবতে যাওয়াও বোকামি। তার ওপর, পদ্মিনী বা চিত্রিণীর সঙ্গে মিলে যায়—এমন আকৃতির বহু নারীকে অতিশয় কামুকী ও দুশ্চরিত্রা দেখতে পাওয়া যায়। অভিনেত্রী ও বেশ্যাদের সবাই শঙ্খিনী ও হস্তিনী নয়!···এ কথা মানো তো?

এটা সত্যি যে, ছিপ্‌ছিপে, রীতিমতো কৃশাঙ্গী ও ঢ্যাঙা গড়নের স্ত্রীলোকের বরাঙ্গ-প্রদেশের পেশীগুলির স্থিতিস্থাপকতা-গুণ সচরাচর একটু কম এবং তাদের নালীর দৈর্ঘ্য ও প্রসারতা অপেক্ষাকৃত একটু বেশী দেখা যায়। এদের সঙ্গে হয়তো শঙ্খিনীর আকৃতির অনেকটা মিল থাকতে পারে, কিন্তু প্রকৃতির মিল্ না-ও থাকতে পারে। লম্বাচৌড়া খুব হৃষ্টপুষ্ট বা মোটাসোটা হস্তিনী জাতীয়া স্ত্রীলোকদের যোনিপ্রদেশের আকার অপেক্ষাকৃত বড় হোলেও সর্বক্ষেত্রে নালীটি যে গভীরতর ও প্রশস্ততর হবে এমন কোন কথা নেই। এদের অনেকরই পেশীর ওপর অত্যধিক চর্বি জমার দরুণ স্থিতিস্থাপকতা গুণ রীতিমতো ব্যাহত হয় এবং এদের অনেকেই প্রসবের সময় এই কারণে যথেষ্ট বেগ পায়। পুনঃ পুনঃ প্রসব না হোলে এবং প্রসবকালে যোনিদ্বার ছিন্নবিক্ষত না হোলে, এদের নালী দীর্ঘকাল প্রীতিপ্রদভাবে অপ্রশস্ত থাকে।

আধুনিক শ্রেণীবিভাগ

পাশ্চাত্য দেহতত্ত্বের পণ্ডিতরা ধাতুপ্রকৃতি-অনুসারে জগতের যাবতীয় স্ত্রীপুরুষকে চার ভাগে বিভক্ত কোরেছেন। যথা—(১) বায়ুপ্রধান বা

বিষাদপ্রবণ [the nervous or melancholic]। এরা সংশয়ী , ভীরু প্রকৃতির, অভিমানী। চিন্তাশীল ও ভাবপ্রবণ। একটু চাপেই ভেঙে পড়ে। (২) পিত্তপ্রধান বা রোষপ্রবণ [the bilious or choleric]। এরা সহজে কোনো কাজে আকৃষ্ট হয় ও তাতে মেতে ওঠে। কাম সম্বন্ধেও এরা অত্যন্ত চেতনশীল। রীতিমত আবদারপ্রবণ ও রুক্ষ মেজাজের হয়। (৩) রক্তপ্রধান বা রাগপ্রবণ [the sanguine]; এরাও অতি সহজে মেতে ও তেতে ওঠে ; সৌন্দর্য ও শিল্পকলার পূজারী ; কর্মে উৎসাহ, নিষ্ঠা ও মৌলিকতা থাকে ; কিন্তু মত ও পথ বদলায় অতি সহজে। (৪) কফপ্রধান বা জড়তা-প্রবণ [lymphatic or phlegmatic]; এরা প্রায়ই ঢিলাপ্রকৃতির, ঠাণ্ডা মেজাজের ও অলস স্বভাবের হয়। প্রায়ই কামে মন্দবেগ ও সহনশীল।...এই বিভাগের সঙ্গে কামাবেগের স্বল্পতা-আধিক্যের কিছু সম্পর্ক থাকলেও জননযন্ত্রের দৈর্ঘ্য-হ্রস্বতার কোন সম্পর্ক নেই। এর আশা করাও বাতুলতা।

আবার কোন কোন আধুনিক সমাজবিজ্ঞানী যাবতীয় স্ত্রীলোককে মোটামুটি দু'ভাগে বিভক্ত কোরেছেন এইভাবে,—(১) কামপ্রধান ও (২) প্রেমপ্রধান বা মাতৃত্বপ্রধান। আবার পুরুষজাতিকে দু' ভাগে বিভক্ত কোরেছেন এইভাবে,—(১) কামপ্রধান ও (২) প্রেমপ্রধান বা পারিবারিক বোধ-প্রধান। এই দুটি কোরে স্থূল বিভাগের মধ্যবর্তী আরো অনেকগুলি কোরে উপবিভাগের অস্তিত্ব তাঁরা স্বীকার কোরেছেন।

স্ত্রীপুরুষের শ্রেণীবিভাগ করা সোজা ব্যাপার নয়। তবে এইটুকু জেনে রেখো, মানুষের বাহ্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখে তার জননযন্ত্রের আয়তন, কামাবেগ, কামবোধ ও কামশক্তির ধারণা করতে যাওয়া সব সময় সমীচীন নয়, নিরাপদ নয়। একজন সতী-সাধ্বী শান্তশিষ্টা মাতৃত্বাকাঙ্ক্ষিণী কুলবধূও দুর্দমনীয়া কামুকী হোতে পারে, একজন বিলাসসজ্জানিপুণা কলারসিকা চটুলচঞ্চলা নায়িকাও নিতান্ত মন্দকামা ও পুরুষবিরাগিনী হোতে পারে।

——ষষ্ঠ বৈঠক——

সম্প্রয়োগ-নাট্য

তাহোলে তোমরা এখন নিশ্চয়ই বিশ্বাস কোরেছ যে, হিন্দু শাস্ত্রকারদের স্ত্রীপুরুষের শ্রেণীবিভাগের ব্যাপারটাকে অবিশ্বাস-করাটা খুব অন্যায় হবে না। স্ত্রীলোকদের যোনিনালী সম্বন্ধে তোমাদের অনেকের যে ভ্রান্ত ধারণা ছিল, এতক্ষণে নিশ্চয়ই তার নিরসন হোয়েছে। পুরুষদের সাধনদণ্ড সম্বন্ধেও তোমরা কিছু কিছু নতুন কথা শুনেছো ; এই বৈঠকের প্রারম্ভে আরো কিছু বলছি—মন দিয়ে শোন।

সাধনদণ্ড সম্বন্ধে আরো কথা

তোমাদের কারো কারো ধারণা যে, ধ্বজ যত বড় হবে তা তত শক্তিশালী ও ভোগনিপুণ হবে। এর চেয়ে ভ্রান্ত ধারণা আর হোতে পারে না। তাছাড়া, স্বাভাবিক নিরুদ্রিক্ত অবস্থায় যে ধ্বজ অসাধারণ রকমের দীর্ঘ স্থূল দেখায়, উদ্রেক-কালে সে তদনুপাতে কিন্তু দীর্ঘতর ও স্থূলতর হয় না। ধর, কোন লোকের সাধনদণ্ড শীতল অবস্থায় ৪॥ ইঞ্চি দার্ঘ ও ৪ ইঞ্চি পরিধিযুক্ত ; সেটা উদ্রিক্ত অবস্থায় দৈর্ঘ্যে বড় জোর এক ইঞ্চি কি সওয়া ইঞ্চি এবং পরিধিতে বড় জোর আধ কি ¾ ইঞ্চি বাড়বে। আবার অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাগোদ্রেকের ফলে ৪ ইঞ্চি দীর্ঘ একটি ধ্বজ এক ইঞ্চি তো বটেই, পাত্রবিশেষে সওয়া ইঞ্চিও বাড়তে পারে। আবার ৩½ ইঞ্চি লম্ব যন্ত্র উদ্রিক্ত হোলে ঠিক এই পরিমাণে বাড়তে পারে, এবং প্রায় ক্ষেত্রেই বাড়েও। পরিধিরও প্রসার প্রায় একই হারে বাড়ে।

আর এক কথা। ছোট বা মাঝারি আকারের দণ্ড রাগকালের আগাগোড়াই যেমন কঠিন অবস্থায় থাকতে পারে, বড় আকারের সাধারণত তা পারে না। তা'ছাড়া বৃহত্তর যন্ত্র ক্ষুদ্রতর আকারের যন্ত্রের

তুলনায় বেশীদিন অর্থাৎ প্রৌঢ়ত্বের শেষ বা বার্ধক্যের প্রথম ভাগ পর্যন্ত উত্থানশীলতাশক্তি অব্যাহত রাখ্‌তে পারে না বহু ক্ষেত্রেই।

রতিকালে শুক্রধারণ-শক্তির সঙ্গে ধ্বজের আকারের কোন সম্পর্ক নেই। যে-কোন আকারের ইন্দ্রিয়-সমন্বিত পুরুষেরই রতিকালীন্ শুক্রধারণ-ক্ষমতা অল্প বা অধিক থাক্‌তে পারে। তাছাড়া, সারা যুবা বয়সে বিভিন্ন স্থানে-ভঙ্গীতে-দিনে ও একই নারী বা বিভিন্না নারী-উপভোগ-কালে একই পুরুষের রতি-স্থায়িত্বের তারতম্য ঘটতে দেখা যায়। তাছাড়া, প্রত্যেকেরই বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অল্পে অল্পে রমণশক্তি ও ধারণশক্তি হ্রাস পেতে থাকে।...সুতরাং যদি কারো আফ্‌শোষই করতে হয়, তাহলে যন্ত্রের হ্রস্বতার জন্যে না কোরে, ধৃতিকালের হ্রস্বতার জন্যেই আফ্‌শোষ করা উচিত। যুবাকালে বা প্রৌঢ়কালে এই ত্রুটি কতক পরিমাণে সংশোধন করা যায়, কিন্তু আশানুরূপ করা যায় না। বার্ধক্যে একেবারেই যায় না।

যাহোক, এইবার হিন্দুশাস্ত্রকারগণ স্ত্রীপুরুষের সম্মিলন-ব্যাপার নিয়ে যে সব তথ্য উদ্‌ঘাটন কোরেছেন, তার সম্বন্ধে রকমারি রীতিনীতি রচনা কোরেছেন এবং তার প্রত্যেকটি অংশের নিপুণ বিচার-বিশ্লেষণ কোরেছেন, তার খানিকটা তোমাদের সকলকে শুনিয়ে দিই।...তাঁরা সমগ্র দৈহিক মিলন-নাট্যকে "সম্প্রয়োগ" নামে অভিহিত কোরেছেন। এই সম্প্রয়োগ ক্রিয়াটিকে তাঁরা পাঁচটি ক্রমিক স্তরে বা সোপানে ভাগ কোরেছেন। অর্থাৎ সমগ্র সম্প্রয়োগ ব্যাপারটিকে একখানি মিলনান্ত নাটক মনে কোরে একে পাঁচটি অঙ্কে বিভক্ত করা হোয়েছে। প্রত্যেক অঙ্কের বা স্তরের পরিচয় একে একে তোমাদের দিচ্ছি, শোনো।—

পাঁচটি অংক কি কি

(১) প্রথম হোলো **রাগোদ্রেক** ও **রতারম্ভিক**। কোনরূপ বাহ্য চেষ্টা ব্যতিরেকে স্বামী-স্ত্রীর অথবা নায়ক-নায়িকার একই সময়ে যে সঙ্গত হওয়ার ইচ্ছা জাগ্‌বে—এমন কোন কথা নেই। অথবা একজনের

বেশী ইচ্ছা জাগতে পারে, অন্যজনের কম ইচ্ছা জাগতে পারে, অথবা সেই সময়টিতে একজন একেবারেই উদাসীন থাকতে বা অনিচ্ছুক হোতে পারে। তখন তাকে ইচ্ছুক ও উত্তপ্ত করবার জন্য অন্যপক্ষ যে সকল ক্রিয়া-কৌশল প্রয়োগ করে, সেগুলির নাম 'উপচার'। এই উপচার শব্দটির সঙ্গে এবং ওর অর্থের সঙ্গে তোমাদের এর আগেই পরিচয় ঘটেছে। আলিঙ্গন, চুম্বন, আচ্ছুরিতক নখদান (সুড়সুড়ি দেওয়া) প্রভৃতি উপচারের কথা জান্‌তে পেরেছো। এর পর উভয়ে যখন অল্প-বিস্তর অথবা সমভাবে উদ্বেলিত হোয়ে রতিরত হবার জন্যে শয্যাগ্রহণ করে, তখন তাকে বলে 'রতারম্ভিক'।

(২) **সম্বেশন** ও **যন্ত্রযোগ**। পুরুষের সাধনদণ্ড অপর পক্ষের সম্বাধে অনুপ্রবিষ্ট করার জন্যে শয়ন বা উপবেশনের যে বিশেষ ভঙ্গী গ্রহণ করা হয়, তার নাম "সম্বেশন"। যখন পুরুষের দণ্ড স্ত্রী-সম্বাধে অভিনিবিষ্ট করা হয়, তখন তাকে বলে "যন্ত্রযোগ"।

(৩) **উপসৃপ্ত**। রতিক্রিয়াকালে পরস্পর পরস্পরকে যে-সব উপচার প্রদান করে এবং যে বিশেষ বিশেষ ভঙ্গিমায় অঙ্গাদি বিক্ষেপ করে, সেগুলিকে সাধারণভাবে উপসৃপ্ত বলা হয়।

(৪) **বিসৃষ্টি**। পুরুষের বীর্যত্যাগ ও স্ত্রীলোকের ইতিহর্ষলাভের সঙ্গে সঙ্গে মূল ক্রিয়ার অবসান। এতে হয় উভয়ের উদ্বেলাবস্থার পরিসমাপ্তি।

(৫) **রত্যবসানিক**। উভয়ে বিযুক্ত হোয়ে যে সকল কৃত্যের মধ্য দিয়ে বিশ্রাম গ্রহণ করে, সেগুলিকে একসঙ্গে বলে রত্যবসানিক।

এইবার একে একে এই পাঁচটি দফা নিয়ে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা সুরু করছি।

রাগোদ্রেক ও রতারম্ভিক

প্রথম দফা সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছু নতুন কথা জানাবার নেই। তখন নায়িকা বা নবীনা স্ত্রীকে উদ্বেলিত করার জন্যে যে পরিবেশের

সৃষ্টি করা হোত এবং যে সকল উপক্রম করা হোত, তার সবগুলিরই সঙ্গে এখনকার কালের হয়তো সাদৃশ্য নেই এবং বাকিগুলি সম্বন্ধে জ্ঞান থাক্‌লেও আধুনিকদের প্রয়োগ করার প্রবৃত্তি নেই। কিন্তু তখনকার কালে রতি ব্যাপারটিকে কত উচ্চ স্তরের সূক্ষ্ম কলা হিসাবে গণ্য করা হোত, তার প্রত্যেকটি স্তরের জন্যে মানুষকে কিভাবে নিজের দেহ ও মনকে অধ্যবসায়ের সঙ্গে প্রস্তুত কোরতে হোত, তার জন্যে কত সাজসরঞ্জাম-উপকরণের সমাবেশ হোত, তার সামান্য বিবরণ দিতে গেলেও পুঁথি বেড়ে যাবে। রতারম্ভিকে পুরুষের তরফ থেকে কি কি কৃত্য ছিল, তার যৎসামান্য একটু আভাস তোমাদের দিয়ে যাই।

কামসূত্র-কার নাগরিককে সম্বোধন কোরে বল্‌ছেন, "পুষ্পোদ্যানে অথবা অন্তঃপুরের রতিগৃহ পুষ্পাদি দ্বারা সজ্জিত করবে ও ধূপ দ্বারা সুরভিত করিয়ে নায়িকাকে নিয়ে সুপ্রস্তুত শয্যায় বা অন্য কোন সুখকর আসনে উপবেশন করবে। নায়িকা স্নান বা গাত্র ধৌত কোরে কেশবেশ প্রসাধন কোরে আস্‌বে।...নায়িকার ডান দিকে নায়ক বস্‌বে। কেশকলাপে, বস্ত্রাঞ্চলে বা কটি-বন্ধনে হস্তস্পর্শ কর্‌বে। বাম বাহু দ্বারা অনুদ্ধতভাবে (অর্থাৎ যাতে অসন্তুষ্ট না হয় এমনভাবে) আলিঙ্গন কর্‌বে। হাস্য পরিহাস কর্‌বে, অনুরাগজনক কথা বল্‌বে। গূঢ়ার্থব্যঞ্জক অশালীন বিষয়ের অবতারণা করবে।...গীতবাদ্য ও নৃত্য কর্‌বে। পান করবে এবং পান করাবার চেষ্টা কর্‌বে।...তারপর নায়িকাকে উদ্রিক্তরাগ হোতে দেখ্‌লে এমনভাবে তাকে পূর্বোক্ত চুম্বনালিঙ্গনাদি-দ্বারা রোমাঞ্চিত ও কামাবিষ্ট করবে যাতে সে শয্যায় এলিয়ে পড়ে। তারপর তার গাত্রাবরণ ও কোমরের কষি উন্মোচন কোরে যন্ত্রযোগের উপক্রম করবে।"

সম্বেশন ও যন্ত্রযোগ

সম্বেশন ও যন্ত্রযোগ কাকে বলে, তা তোমাদের আগেই বোলেছি। সম্বেশন ও যন্ত্রযোগ একই ক্রিয়ার পূর্বপর অঙ্গাঙ্গি অংশ বোলে মনে

কোরতে হবে। এই উভয় অংশকে এককথায় বলা হয় "বন্ধ"। স্ত্রীপুরুষের লৈঙ্গিক আকারের সমতা বা বৈষম্য-ভেদে বাৎস্যায়ন পাঁচ রকমের যন্ত্রযোগ বিবৃত করেছেন। যথা,—

(১) **সমরত**। যখন পুরুষের সাধনদণ্ড দৈর্ঘ্যেপ্রস্থে এরূপভাবে গঠিত থাকে যে, কোন বিশেষ নারীর সম্বাধে কোন পক্ষেরই অসুবিধা না ঘটিয়ে অভিনিবিষ্ট হয় এবং তন্মধ্যে দৃঢ়ভাবে বিধৃত হয়, তখন তাকে বলে সমরত।

(২) **উচ্চরত**। যখন কোন সাধননণ্ড নারী-সম্বাধে (হয় সাধন-দণ্ডের বৃহত্ত্ব হেতু নতুবা সম্বাধের অপরিসরতা হেতু) অল্পায়াসে অর্থাৎ সামান্য ক্লেশকরভাবে অভিনিবিষ্ট হয়, তখন তাকে উচ্চরত বলা হয়।

(৩) **উচ্চতররত**। যখন কোন পুরুষাঙ্গ দৈর্ঘ্যে ও বেধে এরূপ হয় যে, নারী-সম্বাধে অনুপ্রবিষ্ট করাতে গেলে নারীর অতিশয় ও পুরুষেরও সামান্য কষ্টবোধ হয় এবং সম্পূর্ণ অভিনিবেশ দুঃসাধ্য হয়, তখন তাকে বলে উচ্চতররত।

(৪) **নীচরত**। যখন পুরুষাঙ্গের ক্ষুদ্রতা হেতু অথবা নারীযন্ত্রের বিশালতা হেতু যন্ত্রযোগ যৎকিঞ্চিৎ শ্লথ হয় এবং উভয়ের পক্ষে রতি আশানুরূপ সুখকর হয় না, তখন তাকে বলে নীচরত।

(৫) **নীচতররত**। যখন পুরুষাঙ্গের ক্ষুদ্রতা এবং নারীযন্ত্রের বিশালতা—এই উভয় কার্যকারক একত্র হোয়ে যন্ত্রযোগ অত্যন্ত শ্লথ ও অস্বাচ্ছন্দ্যজনক কোরে তোলে, তখন তাকে বলে নীচতররত।

তোমরা বুঝ্‌তে পাচ্ছ যে, উচ্চতররত ও নীচতররত এই উভয়বিধ যন্ত্রযোগই কোন দম্পতির নিকট প্রিয় ও প্রীতিকর নয়। বিবাহের অব্যবহিত পর থেকে যদি কিছুকাল এইরকম চলতে থাকে, তাহলে উভয় উভয়কে পুরোপুরি ভালবাসতে পারে না। তখন দু'পক্ষ না হোক, অন্তত একপক্ষও রতি-ব্যাপারে রীতিমতো বীতস্পৃহ হোয়ে পড়্‌বে। এদের

দুজনের কেউ যদি পাত্রান্তরে রতিসুখ অন্বেষণ করে, তাহলে সেটা নীতি-ধর্মের দিক্ দিয়ে খানিকটা আপত্তিকর হোলেও দেহধর্মের দিক্ দিয়ে খুব অন্যায় বলা চল্‌বে না।

যাই হোক্, উচ্চরত, উচ্চতররত, নীচরত ও নীচতররতের অসুবিধা যথাসাধ্য দূর করবার উপায়ও সেকালের কামকলাবিদ্‌গণ উদ্ভাবন কোরে গিয়েছেন। সম্বেশনের রকমারি কায়দায় অপ্রশস্ত যোনিনালী প্রশস্ত হোতে পারে অথবা প্রশস্ত যোনিনালী সংকীর্ণ হোতে পারে। বাৎস্যায়নের বহুপূর্ববর্তী, বাভ্রব্য নামক একজন বহুদর্শী কামশাস্ত্রকার সাতপ্রকার বন্ধের নামোল্লেখ কোরে গিয়েছেন। তন্মধ্যে তিনপ্রকার সম্বেশন অপ্রশস্ত নালীকে যন্ত্রযোগকালে প্রশস্ত করার জন্যে; এবং বাকি সম্বেশনগুলি প্রশস্ত নালীকে সাময়িকভাবে সংকুচিত করার জন্যে। একে একে এদের উল্লেখ কোরে যাচ্ছি। বলা বাহুল্য, প্রথম তিন দফা—যারা নববিবাহিতা, সন্তানবঞ্চিতা, চিরবন্ধ্যা, স্বভাবত হ্রস্বনালী—তাদের পক্ষেই প্রযোজ্য।

(১) **উৎফুল্লক**। মাথার তলা থেকে বালিস সরিয়ে মাথাটি শয্যার ওপর রেখে, হাঁটু দুমড়ে পায়ের পাতা আর জঘনদ্বয়কে সামান্য খানিকটা পেটের দিকে এনে ওপর দিকে তুলে ধোরলে, তাকে বলা হয় উৎফুল্লক।

(২) **বিজৃম্ভিতক**। উৎফুল্লকে যেমন হাঁটু ভাঙ্গা হয়, তেমনি কোরে হাঁটু ভেঙে ও পায়ের পাতা ওপরমুখো কোরে উরুদ্বয়কে যদি পেটের ঊর্ধ্বদেশের দু'দিকে যথাসাধ্য টেনে আনা হয় (এবং উরুদ্বয় যদি হাত দিয়ে চেপে রাখা হয়) তাহলে সেই ভঙ্গীকে বলে বিজৃম্ভিতক।

(৩) **ইন্দ্রাণিক**। হাঁটুর কাছে পা দু'খানা মুড়ে ও গোড়ালিদ্বয় নিতম্বপ্রান্তে লাগিয়ে, উরুদ্বয় বিস্ফারিত কোরে জানুদ্বয় যদি কটির দু'পাশে যথাসাধ্য মেলে রাখা হয়, তাহলে তাকে বলে ইন্দ্রাণিক সম্বেশন। প্রাচীন কামকলা-ধুরন্ধরগণ কল্পনার মৌতাতে চোখ বুজে জানতে

পেরেছিলেন—ইন্দ্রপত্নী শচী নিজে এই সম্বেশন গ্রহণ করতেন এবং এইপ্রকার সম্বেশন সম্বন্ধে কোনো কোনো দেববধূকে গোপনে উপদেশ দিয়েছিলেন বোলে ভঙ্গীটির নাম দেওয়া হোয়েছে ইন্দ্রাণিক।]

(৪) **সম্পুটক**। যন্ত্রযোগ করার পর নায়িকা যদি পা দু'খানি প্রায় সরলভাবে ও পাশাপাশি বিছানার ওপর মেলে রেখে দেয় এবং নায়কও ঐভাবে তার নিজের পা দুখানি মেলে ক্রিয়া আরম্ভ করে, তাহলে তাকে বলে সম্পুটক সম্বেশন। এতে যোনিনালির আয়তন হ্রস্বীকৃত হয়। সম্পুটক দু'রকমের আছে। এক রকমের হোলো "পার্শ্ব-সম্পুটক" অর্থাৎ নারীকে এক কাতে শয়ন করিয়ে পুরুষ যদি নিজেও কাৎ হোয়ে অভিরত হয়। [পুরুষের দক্ষিণ দিকে নারীকে শায়িত করানো নিয়ম।] আর এক রকমের হ'ল "উত্তানসম্পুটক" অর্থাৎ নারী চিৎ হোয়ে শয়ান্ থাক্‌বে আর পুরুষ উপুড় হোয়ে তাকে আবৃত কোরে যন্ত্রযোগ করবে।

(৫) **পীড়িতক**। উত্তানসম্পুটক বা পার্শ্বসম্পুটক অবস্থায় শুয়ে, নায়িকা যদি পুরুষের যন্ত্র দ্বারদেশে গ্রহণ কোরে উভয় উরুর ঊর্ধভাগ (মায় মলদ্বার প্রদেশস্থ মাংসপেশী) দ্বারা নায়কের উরুদ্বয় খুব জোরে চেপে ধরে, তাহোলে তাকে বলে পীড়িতক বন্ধ। এই বন্ধে নালীপথ এত সঙ্কুচিত হোয়ে যায় যে, তন্মধ্যে সাধনদণ্ড অনায়াসে বা সম্পূর্ণভাবে প্রবেশ কোরতে পারে না; সবেগে অভিনিবেশ করাতে গেলেও সাধনযন্ত্র যেন প্রত্যাগত হোয়ে আসে।

(৬) **বেষ্টিতক**। নায়িকা যদি যন্ত্রসংযোগের পর একটি পা সোজা মেলে রাখে, আর অন্য পা দিয়ে নায়কের উরুর নিম্নদেশ (অথবা মাঝামাঝি অংশ) বেষ্টন করে, তাহলে তাকে বলে বেষ্টিতক।

(৭) **বাড়বক**। সমুদ্রতীরবর্তী দেশসমূহে একজাতীয় বন্য ঘোটকী দেখতে পাওয়া যায়। এরা ঘোটকের সঙ্গে সম্প্রয়োগ-কালে তাদের

যোনিদেশীয় কয়েকটী মাংপেশীকে সংকুচিত কোরে ঘোটকের সাধনদণ্ডকে নিষ্ঠুরভাবে চেপে ধোরে থাকে এবং নিজেরা ইতিহর্ষ লাভ কোরলে তবে ঐ স্থানের পেশীবন্ধনী শ্লথ করে। এইভাবে কোন কোন শ্লথনালী নারী যোনিদ্বার ও নালী-মধ্যবর্তী পেশীগুলি পাক-সাঁড়াশীর মতো দু'ধার থেকে সাধনদণ্ডকে চেপে ধোরে থাক্‌তে পারে—অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে। তাতে বহু পুরুষযন্ত্র বীর্যক্ষেপ করলেও শীঘ্র শিথিল হোতে পারে না। অবশ্য এ মুদ্রা অভ্যাসসাপেক্ষ। একে বলে বাড়বক।

[ঘোটকী ও কুক্কুরীর মধ্যে এ বিষয়ে যে তফাৎ আছে, সেটা তোমরা এইসূত্রে জেনে রেখে দাও। ঘোটকীর পেশীসংকোচন হয় রতির মধ্যবর্তী সময়ে; এটা তার ইচ্ছাধীন ও তার পক্ষে সুখকর। কিন্তু কুক্কুরীর পেশীসংকোচন হয় রতিক্রিয়ার শেষে; সেটা তার অনিচ্ছাকৃত ও উভয়ের পক্ষেই ক্লেশকর। তাই বীর্যত্যাগের পর কুক্কুর তার সাধনদণ্ড সহজে নালী-মধ্য থেকে বের কোরতে পারে না। ভল্লুক-ভল্লুকীর প্রায়ই অনুরূপ দুর্বিপাক ভোগ করতে হয়।]

সনাতন লোকপ্রিয় সম্বেশন

সর্বকালে সর্বজাতির মধ্যে যন্ত্রযোগের মৌলিক সম্বেশন হোলো—নায়িকার উত্তান (চিৎ) হোয়ে শয়ন ও পুরুষের উপুড় হোয়ে তার বক্ষোপরি শয়ন। যন্ত্রযোগের অব্যবহিত পূর্বে স্ত্রীলোক শয়ন কোরে হাঁটু দুটো ভেঙে পায়ের পাতা দুটো বিছানার ওপর রাখে নতুবা গোড়ালি-সমেত পায়ের পাতা দুটো বিছানা থেকে একটু তুলে ধরে; তারপর দুই হাঁটু বিস্ফারিত কোরে পুরুষলোকের কটিসমেত জঘনপ্রদেশ ওর মাঝখানে আঁট্‌বার মতো জায়গা কোরে দেয়। এই সময় কোনো ক্ষেত্রে স্ত্রীলোক জঘনপ্রদেশ একটু ওপর দিকে তুলে দেয়, নতুবা পুরুষ এক হাত তার তলদেশে দিয়ে তুলে নেয়। এই অবস্থায় পুরুষ হামাগুড়ি দেওয়ার মতো বোসে যন্ত্রযোগ করে। তারপর সে হাঁটু দুটো

স্ত্রীলোকের উরুর তলদেশ দিয়ে দু'পাশে একটু মেলে দিয়ে, হাঁটু ও পায়ের পাতার ওপর ভর দেয়। সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীলোকের বক্ষের ওপর আল্‌তোভাবে শুয়ে পড়ে এবং তার বগলের পাশ দিয়ে হাত দু'খানা ভেঙে দিয়ে কনুইয়ের ওপর ভর দেয়। ইচ্ছা কোর্‌লে হাতের তালু দুটো পাশাপাশি জোড়া কোরে ও যুক্তাঞ্জলি কোরে স্ত্রীলোকের মাথার তলায় রাখতে পারে।

এই সম্বেশন বা বন্ধ সর্বাপেক্ষা সহজসাধ্য, এবং সর্বশ্রেণীর স্ত্রীপুরুষের সাধন-সম্বাধে এর দ্বারা মোটামুটি সুখপ্রদ সংযোজন হয় বোলে জগতের অধিকাংশ লোক এর এত পক্ষপাতী। স্ত্রীলোকের যোনিনালীর দ্বারদেশ থেকে শেষপ্রান্ত পর্যন্ত একটু তির্যগ্‌ভাবে অবস্থিত অর্থাৎ নালীটি সোজাসুজি না থেকে পৃষ্ঠ ও মলকোষ্ঠের দিকে বেশ একটু ঢালু হোয়ে গিয়েছে। পুরুষের সাধনদণ্ড রাগোদ্দীপ্ত হোয়ে যখন উচ্ছ্রিত হয়, তখন সে-ও সোজাসুজি প্রলম্বিত না হোয়ে নিম্নোদরাভিমুখে তির্যগ্‌ভাবে উত্থিত হয়। কাজেই এই ভঙ্গী গ্রহণ কোরলে, পুরুষাঙ্গ সহজভাবে তার নিজের স্থিতি অনুসারে নালী-মধ্যে প্রবেশের পথ পায়; কোন স্থলে তার স্বচ্ছন্দ গতি ব্যাহত হয় না।

মুখোমুখী সম্বেশন সর্বোত্তম কেন

আর এক দিক্ দিয়ে এই ভঙ্গীটি এর বৈশিষ্ট্য ও কান্তিরস রক্ষা কোরেছে। সেটা তোমাদের সকলেরই জেনে রাখা উচিত। পশুত্বের স্তর থেকে অসভ্য মানুষ যখন সবে মনুষ্যত্বের স্তরে এক ধাপ মাত্র উঠেছিল, তখনি সে এই ভঙ্গীটিকে সর্বপ্রথম উদ্ভাবন কোরেছিল। পশুপক্ষী-দের প্রত্যেক জাতি ও শ্রেণীর স্ত্রীপুরুষ বিপরীতমুখী হোয়ে রতিক্রিয়া করে এবং স্ত্রীর পশ্চাদ্দেশ থেকে পুরুষ অভিক্রম করে। কিন্তু এই ভঙ্গীটিতে মানুষ পশুকে অতিক্রম কোর্‌ল এবং তার চেয়ে উন্নততর ও প্রগাঢ়তর আসঙ্গের পরিকল্পনা কোরল।

ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, স্ত্রীপশু রাগোদ্দীপ্ত পুরুষের কদাচিৎ সম্মুখীন্ হয়। সে প্রায় ক্ষেত্রে পিছন ফিরে ওর কাছ থেকে পালাতে চেষ্টা করে এবং পুরুষ খানিকক্ষণ তার পশ্চাদ্ধাবন কোরে তবে তার নাগাল ধরে। এই সম্বেশনে স্ত্রী সর্বপ্রথম তার লজ্জারাগরঞ্জিত উৎসুক হৃদয় নিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে—পুরুষের সম্মুখীন হোয়ে, তার মুখে মুখ, বুকে বুক দিয়ে সর্বাঙ্গ স্পর্শ করবার সুযোগ পেল—তাকেও সুযোগ দিল। তাছাড়া প্রায় পশুই দণ্ডায়মান অবস্থায় অভিরত হয়, কিন্তু শয়ন কোরে সবচেয়ে সুখসাধ্য সন্ধিটির সন্ধান বের করল মানুষ। যন্ত্রযোগের সঙ্গে যে-সব আনুষঙ্গিক উপচার উভয়ের রাগবৃদ্ধির নিমিত্ত প্রয়োজন, সেগুলো সমস্তই এতে তারা প্রয়োগ করার সুবিধে পেল।...

এক রকম ভঙ্গীতে নিত্য মদনোপাসনা করা কোন সুস্থ সবল একাভিমুখী রম্যভাবাপন্ন প্রেমিকপ্রেমিকার নিকট সমভাবে চিত্তাকর্ষক না হোতে পারে। সেইজন্য অন্য সম্বেশন গ্রহণ কোরে মাঝে মাঝে রুচিবদল করতে হয়। হিন্দু কামকলারসিকগণ একঘেয়েমি-বোধের সম্ভাবনীয়তা সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। তাই তাঁরা স্ত্রীপুরুষের নানা প্রকার ভঙ্গীতে সম্প্রয়োগ উদ্ভাবন কোরে সেগুলি জনসাধারণের মধ্যে প্রচার কোরে গিয়েছেন। সেগুলির গুটি কয়েকের সঙ্গে পরবর্তী একটি বৈঠকে তোমাদের পরিচয় ঘটবে। এখন যন্ত্রযোগের পর স্ত্রীপুরুষের কি কর্তব্য সে সম্বন্ধে তোমাদের সংক্ষেপে কিছু বলি।

উপস্পৃষ্ট

উপস্পৃষ্ট দু'রকমের আছে—**বাহ্য ও আভ্যন্তর**। আভ্যন্তর উপস্পৃষ্টের দু'টি স্তর—একটি **করোপস্পৃষ্ট**, অন্যটি **যন্ত্রোপস্পৃষ্ট**। বাহ্যোপস্পৃষ্ট ও করোপস্পৃষ্ট যন্ত্রযোগের পূর্বে এবং যন্ত্রোপস্পৃষ্ট যন্ত্রযোগের পরে প্রদান করা বিধি। সমস্ত উপস্পৃষ্টই পুরুষের প্রযোজ্য; কারণ তোমরা জান যে, রতি-ব্যাপারের প্রারম্ভে নারী প্রায় নিষ্ক্রিয় থাকে,

মধ্যভাগে সামান্য সক্রিয় ও শেষভাগে সুস্পষ্ট সক্রিয় হয়। তা ছাড়া, আরো জেনে রাখো, দীঘির জলের মতো তারা সহজে তপ্ত হয় না এবং একবার তপ্ত হোলে সহজে ঠাণ্ডা হয় না। অনেক সময় তার উপরিভাগ শীতল বোধ হোলেও তলদেশ ঈষত্তপ্ত থাকে। পুরুষ ঠিক এর উল্টো; সহজে তাতে এবং সহজে তাপ ছেড়ে ঠাণ্ডা হোয়ে যায়। রমণীকে শুধু উপযুক্ত মাত্রায় প্রতপ্ত করা নয়, তার বিলম্বিত রতিকে অপেক্ষাকৃত অগ্রসর কোরে নেবার জন্যে উপচার ও উপস্পৃষ্ট উভয়ের নিয়োগ বাঞ্ছনীয়।

আগেই বোলেছি যে, বিবিধ উপচার-প্রদানের ফলে স্ত্রীলোক যখন অল্পবিস্তর উদ্রিক্ত হয়, তখন তার চোখে-মুখে ও সর্বাঙ্গে ভাবলক্ষণ প্রকাশ পায় এবং সে তখন শয্যাগ্রহণের উপক্রম করে। এর পর তার নীবি-উন্মোচন কোরতে হয়। নীবিউন্মোচন করায় ব্যাঘাত জন্মালে এবং উপসর্পণে বিশেষ উত্তরদায়িনী না হোলে অথবা স্পষ্ট অনিচ্ছা প্রকাশ করতে থাক্‌লে বুঝতে হবে যে, তখনো সে পুরোপুরি প্রতপ্ত হয়নি অথবা রমণী-স্বভাব-সুলভ লজ্জাশীলতার শেষ অন্তরাগ ও কৃত্রিম বাধাদানের ভাব প্রশমিত হয়নি। বাৎস্যায়ন উপদেশ দিচ্ছেন, "ঐ সময় কপোলচুম্বন দ্বারা নায়িকাকে পর্যাকুল কোরে তুল্‌বে।....কক্ষ (বগল), সংহত উরু ও স্তন-প্রদেশ পরিস্পর্শ করবে, উরুদ্বয়ের সন্ধিস্থানে সংঘট্টন করবে।...চুম্বনার্থ তার ললাটপ্রদেশ (যেখানে চূর্ণ অলকগুলি দোলে) নির্দয়ভাবে গ্রহণ করবে। গণ্ডের ঊর্ধ্বভাগ দুই অঙ্গুলির (বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমার) মধ্যভাগে পেষণ করবে।" এই সমস্ত উপচার এবং গোপন প্রদেশের উপরিভাগে হস্তবিলেপন, আচ্ছুরিতক নখদান, চুম্বন প্রভৃতিকে বাহ্য উপস্পৃষ্ট বোল্‌তে পারা যায়।

তারপর নায়িকার নালী-মধ্যে করাঙ্গুলি অভিনিবিষ্ট করিয়ে মৃদুভাবে বিঘট্টন কোরতে হয়। একে বলে "করোপস্পৃষ্ট"। যখন দেখবে যে, অভ্যন্তরভাগ কোমল ও সরস হোয়ে এসেছে, তখনি যন্ত্রযোগ করবে।

হস্তী কামোন্মত্ত হোয়ে যন্ত্রযোগ করার আগে হস্তিনীর সম্বাধমধ্যে শুণ্ডাগ্র প্রবেশ কোরিয়ে আলোড়ন করে ; তার ফলে হস্তিনী কামাবিষ্টা ও স্ফুরিতজঘনা হোয়ে হস্তীর সম্মুখভাগে হুমড়ি খেয়ে শুয়ে পড়ে।... বিঘট্টনের পূর্বেই যদি স্থানটি রীতিমতো রসাক্ত দেখ, তাহোলে করোপসৃপ্ত প্রয়োগের দরকার নেই।

কৃরিকরাগ্রহস্তে করোপসৃপ্ত করতে হয়। অর্থাৎ, অনামিকা ও কনিষ্ঠা পাশাপাশি জোড়া দিয়ে, তার খানিকটা তলার দিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের উপরাংশটি শক্ত কোরে চেপে ধরতে হয় ; তাহলে এই তিনটি আঙুলের সমন্বয় একটি হস্তিমুখের আকার দান করে। অবশিষ্ট তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলি দুটিকে গায়ে গায়ে লাগিয়ে সোজা রাখ্‌তে হয়।...নববিবাহিতা অথবা অসন্তানবতী রমণীর সম্বাধে দুটি অঙ্গুলি (অনামিকা ও কনিষ্ঠা যুক্তভাবে) সন্নিবেশ করানো এবং বাকি সমস্ত শ্রেণীর রমণীর বা স্বৈরিনীর সম্বাধে তিনটি আঙুল অভিনিবেশ করানো হোলো রীতি।

কামসূত্রের ভাষ্যকার যশোধরেন্দ্র নারীভেদে সম্বাধ বা জনন-নালিকার গাত্র চার রকমের হয় বোলে মত প্রকাশ কোরেছেন। অঙ্গুলির দ্বারা স্পর্শ করলে—(১) যার গাত্র পদ্মদলের মত কোমল, মসৃণ ও ঈষৎ সিক্ত বোলে বোধ হয়, (২) যার গাত্রে গুটিকাবৎ বা অনেকগুলি বড়ির মতো মাংসপিণ্ড সাজানো আছে বোলে মনে হয়, (৩) যার গাত্রে বলয়াকারে কতকগুলি কুঞ্চিত পেশীরেখা বিস্রস্ত রয়েছে বোলে বোধ হয়, এবং (৪) যার গাত্র গোজিহ্বার মতো খস্‌খসে ও শুষ্ক বোধ হয়।... যশোধরেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তের মূলে কিছু বহুদর্শনলব্ধ সত্য আছে বোলে বিশ্বাস করা যায়। কারণ, বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সকল নারার নালী-গাত্র সমান কোমল ও সুখস্পর্শ নয়। যাহোক্‌, যশোধরেন্দ্র বোলেছেন—দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ প্রকারের সম্বাধগাত্র যাদের, তাদেরি প্রতি আভ্যন্তর উপসৃপ্ত ভালোভাবে প্রয়োগ করতে।

এইতো গেল আভ্যন্তর শ্রেণীর করোপসৃপ্তের কথা। তারপর যন্ত্র-সংযোগ কোরে, অঙ্গাদি আন্দোলন-দ্বারা সাধনদণ্ডকে সম্বাধ-মধ্যে যত-প্রকারে চালিত করা হয়, সেগুলিকে একত্র "যন্ত্রোপসৃপ্ত" বা "পুরুষোপসৃপ্ত" নামে অভিহিত করা হয়। এইবার তার কথা আরম্ভ কোরছি। ঋষি বাৎস্যায়ন দশ রকমের পুরুষোপসৃপ্তের উল্লেখ কোরেছেন এবং টীকাকার যশোধরেন্দ্র তার প্রত্যেকটির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। একে একে সেগুলির পরিচয় দিয়ে যাচ্ছি।—

(১) **সামান্য উপসৃপ্তক**। এতে সরলভাবে সাধনদণ্ড অভিনিবিষ্ট করিয়ে অল্পবিস্তর কটি-উন্নয়ন ও অবনমন দ্বারা রতি করা হয়।

(২) **মন্থন**। সাধনদণ্ডকে গোড়ার দিকে কর-দ্বারা ধৃত কোরে সম্বাধ-মধ্যে চতুর্দিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে যে রতি, তাকে বলে মন্থন।

(৩) **হুল**। স্ত্রীর জঘনপ্রদেশ নিম্নাভিমুখী কোরে ও সাধনদণ্ডকে উপরিভাগে এনে হুল্‌ ফুটিয়ে দেবার মতো ভঙ্গিমায় নালীপ্রান্তের নীচের খাঁজে যে সবেগে আন্তঃপ্রবেশন ও ঘট্টন, তার নাম হুল্‌।

(৪) **অবমর্দন**। স্ত্রীর জঘনপ্রদেশকে উচ্চাভিমুখী কোরে সাধন-দণ্ডকে উপরিভাগে এনে নালীপ্রান্তের উপরের খাঁজে যে সবেগে আন্তঃ-প্রবেশন ও ঘট্টন, তার নাম অবমর্দন। [সাধনদণ্ড একটু দীর্ঘ হ'লে এই উপসৃপ্তকে প্রায় স্ত্রীলোকগণ বেদনা বোধ করে।]

(৫) **পীড়িতক**। সবেগে আমূল অভিনিবিষ্ট করার সঙ্গে সঙ্গে সাধনদণ্ডকে উন্নমন ও অবনমন করিয়ে সম্বাধকে পীড়া দেবার যে চেষ্টা, তাকে বলে পীড়িতক।

(৬) **নির্ঘাত**। সাধনদণ্ড অভিনিবিষ্ট কোরিয়ে, পুনরায় বহুদূর পর্যন্ত তাকে বহিরাকর্ষণ কোরে (প্রায় দ্বারপ্রান্ত পর্যন্ত) এনে সবেগে যে বারংবার অনুপ্রবেশ করানো হয়, তার নাম নির্ঘাত। [ঐ সময় নির্ঘাত গ্রহণ করার জন্যে অভিজ্ঞা ও রসজ্ঞা স্ত্রীও কটি উত্তোলিত কোরে দেয়।]

(৭) **বরাহঘাত**। সম্বাধের একপার্শ্ব ঘেঁষে পুনঃপুন সাধনদণ্ডের যে সঞ্চালন ও অভিঘাত-দান, তার নাম বরাহঘাত।

(৮) **বৃষাঘাত**। বরাহঘাত যেমন একপার্শ্বে প্রয়োগ করা বিধি, বৃষাঘাত সেই রকম পর্যায়ক্রমে উভয় পার্শ্ব ঘেঁষে বারংবার প্রদান করা বিধি।

(৯) **চটকবিলসিত**। সাধনদণ্ড অভ্যন্তরে নিবিষ্ট কোরে এবং অতি অল্প মাত্রায় বাহিরের দিকে টেনে এনে যদি সেই স্থানে সাধনদণ্ডকে দুই, তিন কি চারবার সংঘট্টন করা হয় এবং পুনরায় পূর্ণনিবিষ্ট করিয়ে দেওয়া হয়, তাহোলে তাকে বলে চটকবিলসিত উপসৃপ্ত। [স্খলন না হওয়া পর্যন্ত দ্রুত পর্যায়ে এই রকম করতে হয়।]

(১০) **সম্পুট**। সম্পুটক সম্বেশনের কথা তোমাদের আগেই বোলেছি। ঐরূপ ভঙ্গীতে স্ত্রীপুরুষে যন্ত্রযুক্ত হওয়ার পর যদি সাধনদণ্ডকে স্থির রেখে শেষ পর্যন্ত উভয়ে জঘন আন্দোলিত ও পরস্পর সংঘৃষ্ট করতে থাকে, তাহোলে তাকে বলা হয় সম্পুট উপসৃপ্ত।

পণ্ডিতগণ বলছেন স্ত্রীলোকের স্বভাব ও রুচি বুঝে এই উপসৃপ্তগুলি দিন বিশেষে ব্যবহার কোর্‌তে। আরবী গ্রন্থকারগণ—বিশেষভাবে শেখ নেফ্‌জাউই হিন্দু কামশাস্ত্রের ওপর প্রধানত নির্ভর কোরে রতিকালোচিত ছ রকমের অঙ্গান্দোলনের বিবরণ দিয়েছেন। "থিয়াতে-এল্‌-হেউব", "নেজা-এল্‌-দেলা", "তচিক্‌-এল্‌-দেলা" প্রভৃতি ভঙ্গীগুলির পরিচয় বাহুল্যবোধে এখানে আর দিলাম না।

বিসৃষ্টি

বিসৃষ্টি বোল্‌তে আমরা আসল রতিক্রিয়ার অন্তিম অবস্থা বোঝাতে চাইছি। অর্থাৎ সুরত ব্যাপারের শেষ সময়ে যখন স্ত্রী ও পুরুষ আনন্দের শীর্ষদেশে এসে পৌঁছয়, সেই সময় উভয়ে বিসৃষ্টি লাভ করে। আমি শাস্ত্রীয় বিসৃষ্টি শব্দটি প্রয়োজনবোধে ত্যাগ কোরে তৎপরিবর্তে

'ইতিহর্ষ' পরিভাষাটি গঠন কোরে ব্যবহার করছি। 'ইতি' শব্দটির অর্থ শেষ এবং শ্রেষ্ঠ দুই-ই। এখানে এই দুটি অর্থেই শব্দটিকে যোজনা করা হোয়েছে। ইতিহর্ষের সময় পুরুষ বীর্যত্যাগ করে; স্ত্রীলোক প্রায়ক্ষেত্রেই তার জরায়ুগ্রীবার অভ্যন্তরভাগ থেকে একপ্রকার রস নিষেক করে, কিন্তু সকলে নয়—সর্বক্ষেত্রে নয়। এ সম্বন্ধে আমি আমার অন্যান্য গ্রন্থে সবিস্তার আলোচনা কোরেছি, কাজেই তার পুনরুল্লেখ কোরে আর পৃষ্ঠা ভরাতে চাই না। তোমাদের মধ্যে যারা আমার লেখা কোন বই পড়োনি, তাদের শুধু সংক্ষেপে জানিয়ে দিতে চাই যে, রতিক্রিয়ার শেষে মেয়েদের যোনিনালী থেকে পুরুষের বীর্যের মতো কোন শ্বেতাভ আঠালো সারবান পদার্থ অনিবার্যভাবে নির্গত হয় না।

আগেই বলেছি, রতিক্রিয়ার শেষভাগে ইতিহর্ষ-লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে বীর্যের চেয়ে পাৎলা, লালার মতো স্বচ্ছ বা অর্ধস্বচ্ছ রস তিন-চার বিন্দু মাত্র মেয়েদের জরায়ুমুখ দিয়ে বেরোতে পারে। কিন্তু জেনে রাখো যে, বহু রমণীর প্রতি ইতিহর্ষের সময় এই বিসৃষ্টিরস নির্গত হয় না; আবার কোন কোন রমণী রতিক্রিয়ান্তে প্রায়ই ইতিহর্ষ লাভ করার সুযোগ পায় না।...যাই হোক্‌, নারীর বিসৃষ্টি-রসের মধ্যে—পুরুষের বীর্যে যেমন ফস্ফেট্‌ প্রভৃতি মূল্যবান পদার্থ থাকে—সেরূপ কোন পদার্থ থাকে না; তদুপরি—পুরুষের বীর্যে যেমন অসংখ্য শুক্রকীটাণু থাকে—সেরূপ কোন অণুদেহী জীব একেবারেই থাকে না। উপরন্তু ভ্রূণোৎপত্তি বা গর্ভধারণের সঙ্গে নারীর এই রসের কোন সম্পর্কই নেই। এই রস বেরুল না অথচ ইতিহর্ষ লাভ করল—এমন নারী সব দেশেই আছে এবং বহুসংখ্যক। সমগ্র কামজীবনে একবার, দু'বার বা তিনবার মাত্র ইতিহর্ষ লাভ কোরেছে অথবা মোটেই করেনি—এমন নারীর সংখ্যা পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ ছিল, এখনো আছে।

ইতিহর্ষের সময় জরায়ু একটু নীচের দিকে নেমে যায়, পুরুষের

ইন্দ্রিয়ের অগ্রভাগকে অল্পবিস্তর ঠেসে বা চেপে ধরার চেষ্টা করে। জরায়ুর সরু গলাটা বেশ শক্ত হোয়ে যায়। ঐ গলার শেষপ্রান্তে যে সচ্ছিদ্র মুখ আছে—চারিপাশের মাংসল ওষ্ঠ সমেত সেটা আল্‌গা হোয়ে বার কয়েক খোলে আর বন্ধ হয়। [ঐ সময়ই ফোঁটা কয়েক রস পড়তে পারে। সাধারণত অন্য সময় জরায়ুর সরু ছিদ্রটি কিন্তু বন্ধ থাকে।] ইতিহর্ষের সময় সমস্ত স্ত্রীলোকই অল্পবিস্তর সক্রিয় হোয়ে পুরুষকে উপচার প্রদান করে অথবা তার উপচারের সমুচিত উত্তর দান করে। ঘন ঘন ও নির্দয়ভাবে কটি আন্দোলন করে, দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করে, ঘর্মাক্ত হয়। ওর অব্যবহিত পূর্বে ঘন ঘন সশব্দ নিঃশ্বাস ফেলতে থাকে, ঐ সময় অবশ হোয়ে ৩।৪ সেকেণ্ডের জন্য শ্বাস বন্ধ রাখে, অব্যবহিত পরে একটি গভীর তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে সর্বাঙ্গ শ্লথ কোরে দিয়ে শুয়ে পড়ে।

সেকালে পণ্ডিতদের ধারণা ছিল—রতিক্রিয়ার শেষ সময়ে পুরুষের মতো নারীও সচরাচর বিস্পষ্টিরস ত্যাগ করে। কিন্তু সেটা ভুল। যাদের ইতিহর্ষ হোলো অথচ কোন রকম রস বেরুল না, তাদেরো তখন একটা কিছু বেরুল বোলে মনে হয়। ব্ল্যাংক্ শট্-এর মতো ব্যাপার আর কি!···তাছাড়া রমণীর রাগোদ্রেক হোলো যোনিদ্বারের আশেপাশের কয়েকটি অতি ক্ষুদ্র গ্রন্থি (থলি) থেকে ঘামের মতো অল্প মাত্রায় রস নিঃসৃত হোতে থাকে। প্রাচীনেরা এর নাম দিয়েছিলেন—"স্যন্দন"। এই রস যোনিদ্বারে লেগে ও নালিমধ্যে গোড়িয়ে প্রবেশ কোরে সমস্ত জনন-পথটিকে সিক্ত, কোমল ও সুগম কোরে দেয়। রতিক্রিয়া-কালেও স্যন্দন অল্প-অল্প মাত্রায় ক্ষরিত হোতে থাকে। স্যন্দন শব্দটির অন্যতম অর্থ হোলো জল।

এখন, বহু রমণী সঙ্গমে যে ইতিহর্ষ লাভ করে না, তার প্রধান কারণ হোলো—বহু পুরুষ আগেই ইতিহর্ষ লাভ করে ও বীর্যত্যাগ করে। এর পর পুরুষের পক্ষে আর রতিব্যাপার চালানো সম্ভবপরও হয় না—চালাবার

ইচ্ছেও থাকে না। কাজেই রমণী আর ইতিহর্ষ লাভের সুযোগ পায় না। তার ফলে তারা অল্পবিস্তর অতৃপ্ত থেকে যায়। এখন জগতের শতকরা ৭০ থেকে ৭৫ জন পুরুষই স্ত্রীলোকের ইতিহর্ষের পূর্বে বীর্যত্যাগ কোরে রতিক্রিয়া শেষ করে। এদের মধ্যে যুবাবয়সে, রুচিৎ কেউ হয়তো কোন বিশেষ ক্ষেত্রে, স্ত্রীলোকের ইতিহর্ষের সমসময়ে অথবা তার অল্প পরে শুক্রত্যাগ করে।

এই সকল পুরুষের মধ্যে একটা বড় দলই প্রৌঢ়বয়স পর্যন্ত প্রায় প্রতি আসঙ্গেই তাদের পত্নীদের বিস্পষ্টিক্ষরণের তৃপ্তি দিতে পারত—যদি তারা যন্ত্রযোগের পূর্বে স্ত্রীলোককে যথেষ্ট রাগোদ্দীপ্ত করবার কলাকৌশল জান্‌ত ও ধৈর্য-সহকারে তা প্রয়োগ কর্‌ত। প্রাচীন ও আধুনিক প্রত্যেক কামবিদ্যাচার্য পুরুষদের বারবার নিষেধ কোরেছেন অধীর ও ত্বরিতক্রিয় হোতে। প্রাচীন রোমের প্রেমকলাকুশল কবি ওভিদ্ এক জায়গায় গেয়েছেন—

But mark you Venus' joys must not be hurried;
But softly coaxed in dalliance unflurried.···

প্রৌঢ়বয়সে শতকরা ৯০ থেকে ৯৫ জনই, কতকটা মূঢ়তা বশত—কতকটা রতিশক্তির স্বভাবসঙ্গত হ্রস্বতা বশত, তাদের পত্নীদের ইতিহর্ষ-লাভ হোতে বঞ্চিত করে। বাঙালীর মধ্যে নানা বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক কারণে রতিপরিচালন-ক্ষমতা কোমে এসেছে এবং ঐ সঙ্গে অপরিতুষ্টা রমণীর সংখ্যাও বেড়ে গেছে। অশন-বসন-আবাস-স্বাচ্ছন্দ্যের শোচনীয় ন্যূনতার সঙ্গে সঙ্গে যথাসাময়িক ও যথাভীষ্ট স্বামিসঙ্গমের অভাব অসংখ্য নারীকে দেহমনে অসুস্থ কোরছে, পারিবারিক পরিবেশের প্রতি অশ্রদ্ধ ও পতির প্রতি অবিশ্বস্ত হবার প্রেরণা দিচ্ছে। এ এক ভীষণ সমস্যা,—এর উপায় কি?

গড়পড়্‌তা বাঙালী পুরুষের সারা যৌবনকাল একবারের রতিক্রিয়ার

স্থায়িত্ব বড় জোর ৪ থেকে ৫ মিনিট; কিন্তু বাঙালী যুবতীদের সাধারণত ১০ মিনিট রতিক্রিয়া না চালালে ইতিহর্ষলাভ বা বিস্ফষ্টিক্ষরণই হয় না। সেইজন্যে চার-পাঁচ মিনিট কাল ধোরে স্ত্রীলোককে উপচার ও উপস্পৃশ্য প্রদান করা অবশ্যকর্তব্য। প্রৌঢ়ত্বের শেষে ও বার্ধক্যের প্রথমভাগে অনেকের ক্রিয়ার স্থিতিকাল ১ থেকে ½ মিনিটে নেমে আসে। আজকাল পঞ্চান্ন-ছাপান্ন বৎসর বয়সের পর অধিকাংশ বাঙালীরই সঙ্গমক্ষমতা চিরতরে বিনষ্ট হয় নতুবা নামমাত্র উত্থানশক্তি অবশিষ্ট থাকে। অতিশয় সৌভাগ্যবান পুরুষ চৌষট্টি-পঁয়ষট্টি পর্যন্ত যৎসামান্য ক্ষমতা বজায় রাখতে পারেন। লক্ষের মধ্যে একজনের হয়তো ৭০রের পরও কিছুকাল ধ্বজোত্থান-শক্তি কোনমতে টিকে থাক্‌তে পারে। কিন্তু পঞ্চাশোর্ধ্ব বৃদ্ধের পক্ষে অরমিতা কুমারীর বা নিঃসন্তানা যুবতীর দেহে পূর্ণ অনুপ্রবেশ করানো অথবা তাদের তৃপ্তিদান করা অসম্ভব—এটা নিশ্চিত জেনো।

ভারতবাসী তথা বাঙালী যুবকদের মধ্যে এমন কি প্রৌঢ়দের মধ্যে এমন লোক অল্পসংখ্যক দেখা যায় যাদের প্রতি রমণ ১৫ মিনিট থেকে ৩০ মিনিট পর্যন্ত স্থায়ী হয়। অনুসন্ধান নিয়ে দেখেছি যে, ১৫ মিনিটের বেশী ক্রিয়া স্থায়ী হ'লে বেশীর ভাগ নারীই শ্রান্তি বোধ করে। সুস্থ সবল মধ্যবেগা হোলে আরো পাঁচ মিনিটকাল চুপচাপ সহ্য করে; তার পরে রীতিমতো অস্বস্তি বোধ ও স্পষ্ট বিরক্তি প্রকাশ করে। একবারের অতিবিলম্বিত সম্প্রয়োগে গড়্‌পড়তা নারী বড় জোর দুইবার ইতিহর্ষ লাভ করতে পারে—তার বেশী নয়।···

স্বামীদের ত্বরিতস্খলন অভ্যাসের দরুণ অপেক্ষাকৃত মন্দকামা, কর্তব্যপরায়ণা ও পতিপ্রাণা স্ত্রীগণ রতির প্রারম্ভ থেকে যে স্যন্দনরস ক্ষরিত হয়, সেই রসক্ষরণ অনুভব কোরেই সন্তুষ্ট থাক্‌তে চেষ্টা করে। যারা মনে মনে অসন্তুষ্ট হয় অথচ মুখে কিছু বলে না, তারা ঋতুস্রাব ও জরায়ুঘটিত নানা অসুখে ভোগে, মধ্যবয়সে হয় খুব রোগা নয় খুব মোটা হোয়ে

পড়ে, ধর্মের দিকে নতুবা ছেলেমেয়ের আদরযত্নের দিকে খুব ঝুঁকে পড়ে, স্বামিসঙ্গম যথাসাধ্য এড়িয়ে চলে, দেহমনে তাড়াতাড়ি বুড়ো হোয়ে পড়ে।

তাহোলে আমরা দেখ্‌তে পেলুম যে, পুরুষের শুক্রস্খলনের সঙ্গে সঙ্গেই রতিক্রিয়া শেষ হয়; নারীর বিস্ফষ্টিরস ক্ষরণ বা ইতিহর্ষের জন্যে খুব কম পুরুষই অপেক্ষা করে অর্থাৎ নিজের নিঃসারণের পর সাধনযন্ত্র অন্তর্নিবিষ্ট রাখে বা অঙ্গান্দোলন করে। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রেমিক পুরুষ স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা কোরে যখন জান্‌তে পারে যে, তার ইতিহর্ষ হয়নি তখনো পর্যন্ত, তখন তারা আরো এক মিনিট কি দেড় মিনিট রতি পরিচালন করে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্ত্রীকে একটু সক্রিয় হোতে বলে। স্খলনের এক মিনিট কি দেড় মিনিটের মধ্যেই শতকরা নিরনব্বই জন যুবকের ইন্দ্রিয় শিথিল হোয়ে পড়ে। একই সময়ে অথবা মিনিট খানেক আগে-পিছে যে যুগলের প্রায় ইতিহর্ষ-লাভ হয়, তারাই সুরতের আগাগোড়া সমান আনন্দভোগ করে এবং দেহগতভাবে তাদের ভালবাসা দৃঢ়তর ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়।···কিন্তু আমাদের দেশে সে ভাগ্য কয়জন দম্পতির হয়? শ'য়ে এক জোড়ার সে ভাগ্য আছে কিনা সন্দেহ।

রত্যবসানিক

যাহোক্, আসল রতিক্রিয়া শেষ হোলে পর অর্থাৎ পুরুষের স্খলনের অব্যবহিত পরেই সম্প্রয়োগ-নাটকের চতুর্থ অঙ্কের যবনিকাপাত হয়। এইবার পঞ্চম অংক।

নারীর ইতিহর্ষ হোক্ বা না হোক্, আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় উভয়ের আরো দুই-এক মিনিট কাল স্থিরভাবে অবস্থান কোরে শ্রম অপনোদন কোরতে হয়। বিযুক্ত হবার নিমিত্ত তাড়াতাড়ি করা উচিত নয় এবং স্ত্রীকে উপেক্ষা-ভরে ঠেলে ফেলে শয্যাত্যাগ করাও বাঞ্ছনীয় নয়। বরং তার

গাত্রে অল্পক্ষণ হস্তবিলেপন কোরে, সে তৃপ্তিলাভ কোরেছে কিনা জিজ্ঞাসা করা উচিত। নতুবা অস্ফুট শব্দে হাস্য করা উচিত, তাহোলে অপরপক্ষ তৃপ্তি পেলে হাসির প্রত্যুত্তর দেবে। যে সব লোক ক্রিয়ার পর তাড়াতাড়ি সংশ্লেষ ত্যাগ কোরে উঠে পড়ে, শেখ্ নেফ্‌জাউই তাদের অশ্বতরের সঙ্গে তুলনা দিয়েছেন।

প্রাচীন ভারতে রত্যবসানিক একটা রীতিমতো পর্ব ছিল। ঋষি বাৎস্যায়ন পুরুষকে লক্ষ্য কোরে বোল্‌ছেন, "বিযুক্ত হওয়ার পর পরস্পরকে না দেখে সলজ্জভাবে পৃথক পৃথক স্থানে গিয়ে শৌচকার্য (অর্থাৎ মূত্রত্যাগ কোরে গোপনপ্রদেশ জল-দ্বারা ভালোভাবে ধৌত) কর্‌বে। তারপর ফিরে এসে উপযুক্ত স্থানে বোসে পান খাবে ও খাওয়াবে, চন্দন বা ঐ রকমের কিছু অনুলেপন মাখ্‌বে ও প্রিয়াকে মাখিয়ে দেবে। বামহস্ত-দ্বারা তাকে আলিঙ্গন কোরে, মিষ্ট কথায় তাকে সান্ত্বনা দিয়ে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা তাকে আসব জাতীয় কোন বলকর রস পান কোরিয়ে দেবে। নতুবা মিষ্টান্ন ও জলপান করাবে। সহ্য হয় এমন খাদ্য উভয়েই খাবে।... সেই সময় 'এটা খাও, এটা বড় মিষ্টি' ইত্যাদি বোলে নিজে খেয়ে বাকি খাদ্যপানীয় নায়িকাকে উপহার দেবে।...তারপর চাঁদের আলোয় বায়ু-সেবনার্থ বাইরের বারান্দায় এসে বোস্‌বে।"...

বাৎস্যায়ন নানারকম বলকারক খাদ্যপানীয়ের নামোল্লেখ কোরেছেন। কিন্তু আজকালকার সাধারণ লোকে এত কাণ্ড করে না, কোরতে পারে না; রতিক্রিয়ার পর শৌচ-ক্রিয়ান্তে শয্যায় এসে শুয়ে পড়ে। তখনকার কালে সম্ভবত সর্বজাতীয়-প্রেমিকপ্রেমিকা প্রথম রাত্রে অল্প আহার করত এবং মধ্যরাত্রে বিহার করত। ক্রিয়ান্তে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আবার কিছু খাদ্যপানীয়ের সদ্ব্যবহার করত।...এখনকার বিজ্ঞানীরা অবশ্য বলেন সম্ভোগের পর কিছু বলকারক পথ্যপানীয় খেতে ও তারপর কয়েক ঘণ্টার জন্য নিশ্চিন্তে নিদ্রা দিতে।

সপ্তম বৈঠক

সম্প্রয়োগের স্থানকালপাত্র

দুনিয়ায় এমন লোক অনেক পাবে, তোমাদের বাড়ির পাশে অথবা মধ্যেও এমন দু'টি একটি মানুষ দেখ্‌তে পাবে—যারা মোটে ক্ষিদে সহ্য করতে পারে না। ক্ষিদে পেলেই তারা ছটফট করে, তাদের চোখ ফেটে যেন জল আসে; যেখানে যে খাদ্য পাক্ না কেন—কিছু মুখে না দিলে তারা যেন সোয়াস্তি পায় না। এই ধরণের লোক তোমরা রেলে স্টীমারে শ'য়ে শ'য়ে দেখতে পাবে। ক্ষিদে একটু পেয়েছে কি না-পেয়েছে, অম্‌নি তারা একটি জংশন-স্টেসনে হুড়মুড় কোরে নেমে, খাবারওলার কাছে ছুটে গিয়ে, মেটে তেল আর বাদাম তেলে-ভাজা, স্নাত-বাস্‌টে, 'হাতে গরম' পুরী-কচুড়ি-সিঙাড়া-নিমকি, টোকো ছানা আর পচা রসে তৈরি কবিরাজী বড়ির মতো রসগোল্লা, সন্দেশ, মিহিদানা প্রভৃতি গোগ্রাসে খেতে আরম্ভ কোরে দেয়! তাদের চোখমুখের দিকে তাকিয়ে দেখো, মনে হবে যেন তারা কতদিন নির্জলা একাদশী কোরে আছে।

দেখেছো তো, গৃহলক্ষ্মীরাও ঘোম্‌টা ফেলে, সলজ্জ শুচিতার বালাই ঘুচিয়ে, ঠোঙা ধোরে রকমারি মিষ্টান্ন কোঁৎ কোঁৎ কোরে গিল্‌ছেন, ছত্রিশ জাতের এঁটো কলঙ্ক-ধরা পেতলের গ্লাসে পানা পুকুরের জল ঢোক্ ঢোক্ খাচ্ছেন! আবার এমন লোকও ট্রেনে দেখতে পাবে, যারা সত্যি হয়তো আট-দশ ঘণ্টা কিছু খায়নি, তবু রাস্তাঘাটে কিছু কিনে খায় না; খেলে তো বড় জোর একটা কমলালেবু নয়তো দুটো-একটা পাণ। কেমন ক্ষিদে চেপে থাক্‌তে পারে তারা!

বেগ হিসাবে মিলনের প্রকারভেদ

কামের ব্যাপারেও মোটামুটি দু'রকমের লোক আছে জেনো। হিন্দু শাস্ত্রকাররা কামবেগের তারতম্য অনুসারে স্ত্রীপুরুষকে মোটামুটি তিন ভাগে বিভক্ত কোরে গেছেন। অবশ্য এই বিভাগের মধ্যে আরো

অনেকগুলি ক্ষুদ্রতর স্তর আছে আপাতত তিনপ্রকার বেগের কথা তোমাদের জেনে রাখা মন্দ নয়।

(১) **চণ্ডবেগ**। যাদের চণ্ডবেগ, তারা ঘন ঘন অত্যন্ত অধিক মাত্রায় কামেচ্ছার দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং সামান্য কারণেই কামোত্তেজিত হোয়ে ওঠে। এরা কামের বেগ কিছুতেই দমন করতে পারে না এবং ইচ্ছার উদ্রেকের সঙ্গে সঙ্গেই তার পরিতৃপ্তির উপাদান খোঁজে। তখন তারা বুদ্ধিবিবেচনাশূন্য হোয়ে হাতের কাছে যাকে দেখে—যাকে পায়, তাকেই আঁকড়ে ধরে। এদের কেউ কেউ বহুকক্ষণ ধোরে রতিক্রিয়া পরিচালন কোরতে বা উপভোগ কোরতে পারে, আবার কেউ কেউ অতিত্বরিত স্খলন করে। চণ্ডবেগযুক্ত মেয়েরা বেশীদিন রতিবিরহ সইতে পারে না এবং একবারের মৃদু ও ত্বরিত ক্রিয়ানিষ্পত্তিতে তৃপ্তিলাভ করে না। এই শ্রেণীর স্ত্রীপুরুষ একটি সহবাস অন্তে আর একটির জন্যে শীঘ্র ও সহজে প্রস্তুত হোতে পারে।

(২) **মধ্যবেগ**। মধ্যবেগযুক্ত স্ত্রীপুরুষের কামেচ্ছা ঘন ঘন জাগে না, জাগে পরিমিত মাত্রায় এবং এরা অল্পায়াসে তাকে দমন করতে পারে। কিছুদিন উপবাসের পরে এদের বেগ অসংবরণীয় হোয়ে ওঠে বটে, কিন্তু তাই বোলে এরা রুচিৎ কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হয়। এই শ্রেণীর মেয়েদের মধ্যে অনেকে গভীরভাবে ভালবাসতে পারে এবং সেই ভালবাসার মধ্যে প্রেমিকের রতিসামর্থ্যকে খুব উচ্চাসন দেয় না। এরা গৃহিণী হয় ভালো, মা হয় চমৎকার। এই শ্রেণীর বেশীর ভাগ পুরুষই যৌবনে একটু অধিকক্ষণ ধোরে উপভোগ করতে পারে।

(৩) **মন্দবেগ**। মন্দবেগযুক্ত স্ত্রীপুরুষের কাম জাগে মাঝে মাঝে এবং রীতিমতো ক্ষীণভাবে। তাদের অনেকেই অল্পক্ষণস্থায়ী রমণে সন্তুষ্ট হয় এবং কেউ কেউ অল্পক্ষণের মধ্যেই ইতিহর্ষ লাভ করে। এদের একটা বড় দলই কামনাকে চেপে রাখতে পারে অতি সহজে এবং বিপথে

যাবার প্রবৃত্তি এদের মধ্যে আসে কদাচিৎ। এরা বিবাহ-বন্ধনের প্রতি আজীবন বিশ্বস্ত থাকতে চেষ্টা করে। মন্দবেগা কোনো কোনো সুন্দরী স্ত্রীলোক ঠাট্‌ঠমকে সিদ্ধহস্ত হয় এবং যৌবনকালে বহু পুরুষকে আকর্ষণ কোরে তাদের কাছ থেকে স্তুতি ও উপহার আদায় করে, কিন্তু প্যাঁচে না পোড়্‌লে বড়-একটা আত্মদান করে না। স্বামিসংসর্গও এরা সাধ্যমতো এড়িয়ে চলে। প্রেম ও প্রেমিক বিষয়ে অন্তরে এরা অনেকে খুব খুঁতখুতে হয়। ঐশ্বর্যের প্রলোভনে, স্বামি-শাশুড়ির অত্যাচারে বা অন্য গুরুতর কারণে এরা যদি-বা কখনো জেনে-শুনে মন্দপথে যায়, তবু কামের তাড়নায় অন্ধ হোয়ে যায় না।

বলা বাহুল্য, চণ্ডবেগ পুরুষের সঙ্গে চণ্ডবেগা স্ত্রীলোকের, মধ্যবেগ পুরুষের সঙ্গে মধ্যবেগা স্ত্রীলোকের, মন্দবেগ পুরুষের সঙ্গে মন্দবেগা স্ত্রীলোকের মিলনই সর্বাংশে শ্রেয়। কিন্তু বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করবার সময় কার বেগ কোন শ্রেণীর তা জানার উপায় নেই। তার ওপর, যে সব মেয়েদের কৈশোরে বিয়ে হয়, তারা যৌবনে পদার্পণ কোরে অথবা একটি সন্তানের মা হোয়ে, অনেক সময় এক শ্রেণী থেকে আর শ্রেণীতে উঠতে-নামতে পারে। যাই হোক, বেগের দিক্ থেকে নিম্নলিখিত সম্মিলন অবাঞ্ছনীয় ও অপ্রীতিকর বোলে শাস্ত্রকারগণ রায় দিয়েছেন।—

(১) মন্দবেগ পুরুষের সঙ্গে মধ্যবেগা নারীর মিলন।
(২) মন্দবেগ পুরুষের সঙ্গে চণ্ডবেগা নারীর মিলন।
(৩) মধ্যবেগ পুরুষের সঙ্গে মন্দবেগা নারীর মিলন।
(৪) মধ্যবেগ পুরুষের সঙ্গে চণ্ডবেগা নারীর মিলন।
(৫) চণ্ডবেগ পুরুষের সঙ্গে মন্দবেগা নারীর মিলন।
(৬) চণ্ডবেগ পুরুষের সঙ্গে মধ্যবেগা নারীর মিলন।

তোমরা বুঝতে পাচ্ছ—এই ছ'রকমের অসঙ্গত মিলনের মধ্যে ২নং ও ৫নং মিলনই সর্বাপেক্ষা অসুবিধাজনক; উভয়পক্ষেরই ঘোর অপ্রীতিকর।

বিস্ফষ্টি হিসাবে মিলনের প্রকার-ভেদ

বিস্ফষ্টি-লাভের বিলম্ব হিসাবে শাস্ত্রকারগণ স্ত্রীপুরুষ প্রত্যেক জাতিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত কোরে গেছেন। তোমরা নিশ্চয়ই জান্‌তে পেরেছ যে, জাতিগতভাবে নারীগণের রতির স্থায়িত্ব পুরুষ অপেক্ষা বেশী হয়, কিন্তু গড়পড়তা পুরুষের স্থায়িত্ব কম বোলে বাধ্য হোয়েই তাদের অধিকাংশের বেশীর ভাগ রতি অসমাপ্ত থেকে যায়। প্রত্যেক স্ত্রীলোক বা পুরুষকেই রতিক্রিয়া ও ইতিহর্ষ-লাভের সময়ের অনুপাতে নিম্নোক্ত তিন শ্রেণীর যে-কোন একটির অন্তর্ভুক্ত করা যায়। যাদের অত্যন্ত বিলম্ব হয়, তাদের বলা হয় **চিরসম্ভববিস্ফষ্টি**। যাদের মাঝামাঝি বিলম্ব হয়, তারা হোলো **মধ্যসম্ভববিস্ফষ্টি**। যাদের খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়, তাদের বলা হয় **শীঘ্রসম্ভববিস্ফষ্টি**।

প্রাচীন পণ্ডিতেরা এই তিন শ্রেণীর স্ত্রীপুরুষের রতিকালের সময়ের একটা নির্ঘণ্ট দিয়ে যাননি, অর্থাৎ পল-বিপলে একটা হিসাবের তালিকা প্রস্তুত কোরে যান্‌নি (তখন তো আর ঘণ্টা, মিনিট, সেকেণ্ড ছিল না)। এখন পাঠকপাঠিকাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো আমাকে কৌতূহলী হোয়ে জিজ্ঞাসা করবে—উপরোক্ত তিন শ্রেণীর স্ত্রীপুরুষের রতিস্থায়িত্বের সময় কমপক্ষে কয় মিনিট হওয়া উচিত। এই জায়গায় আমি তোমাদের কাছে কোন authority কোট্‌ কোরে দেখাতে পারব না। এখানে আমার নিজেকেই অথরিটি-রূপে খাড়া করতে হবে। এর সীমানির্দেশ করা বড় শক্ত ব্যাপার ; তবুও তোমাদের অনুরোধে মোটামুটি একটা ধারণা জন্মিয়ে দিচ্ছি।

বাঙালী স্ত্রীপুরুষদের কথাই বল্‌ছি। চিরসম্ভববিস্ফষ্টি শ্রেণীর লোকদের একবার পুরোপুরি রতিস্থায়িত্বকাল অন্ততঃ পক্ষে পনেরো মিনিট হওয়া চাই। মধ্যসম্ভববিস্ফষ্টি শ্রেণীর লোকদের একবার পুরোপুরি রতির স্থায়িত্ব-কাল হওয়া চাই খুব কম কোরেও সাত মিনিট। আর তার চেয়ে অল্প-ক্ষণ-

স্থায়ী রতি যাদের, তারা সবাই শীঘ্রসম্ভববিস্ফষ্টি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। বাঙালীর দাম্পত্য জীবনের অনেক গূঢ় সংবাদ আমার জানার সুযোগ ঘোটেছে। সেই অভিজ্ঞতার বলে আমি স্বচ্ছন্দে এই মত প্রকাশ করতে পারি যে, আজকালকার শতকরা ৯০ জন বাঙালী পুরুষ শীঘ্রসম্ভববিস্ফষ্টি পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত, বোধ হয় ৯ জন মধ্যসম্ভববিস্ফষ্টি ও ১ জন মাত্র চিরসম্ভববিস্ফষ্টি স্বভাবের বোলে দাবি করতে পারে।

এই সূত্রে আর একটা কথা মনে রাখতে হবে। একই পুরুষের মধ্যে বয়স হিসাবে রতিকালের তারতম্য হয়। আবার বিভিন্ন ভঙ্গীতে, বিভিন্ন দৈহিক ও মানসিক অবস্থায়, অথবা বিভিন্ন নারী-উপভোগ-কালে সাময়িকভাবে বিস্ফষ্টিকাল বাড়ে বা কমে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, পুরুষ যদি নারীকে আপন দেহোপরি আরোহণ করিয়ে তাকে সক্রিয়ভাবে উপভোগ করার সুযোগ দেয় এবং নিজে অপেক্ষাকৃত নিশ্চেষ্ট থাকে, তাহোলে তার স্খলনক্রিয়া কিছু বিলম্বিত হোতে পারে। তারপর, যে পুরুষ যৌবনে চিরসম্ভববিস্ফষ্টি থাকে, সে প্রায় ক্ষেত্রেই প্রৌঢ়কালে মধ্যসম্ভববিস্ফষ্টি হোয়ে পড়ে।

মেয়েরা কিন্তু আজীবন প্রায় একই শ্রেণীভুক্ত থেকে যায়, অর্থাৎ যে যৌবনে মধ্যসম্ভববিস্ফষ্টি থাকে, সে স্বভাবত বৃদ্ধবয়স পর্যন্ত ঐ শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত থাকে। তবে পুরুষদের মতো বিভিন্ন ভঙ্গীতে বা সম্বেশনে, বিভিন্ন মানসিক বা দৈহিক অবস্থায়, তাদের রতি-স্থায়িত্বের হ্রাসবৃদ্ধি হোতে পারে। ধর,—অত্যন্ত পরিশ্রান্ত বা নিদ্রাতুর অবস্থায় সর্ব শ্রেণীর রমণীরই অপেক্ষাকৃত শীঘ্র বিস্ফষ্টি-লাভ হোতে পারে। তারপর অত্যন্ত প্রগাঢ়ভাবে ও একটু বেশীক্ষণ ধোরে উপাচার প্রয়োগ কোরেও প্রায় সব নারীই তাড়াতাড়ি ইতিহর্ষ লাভ করে। আবার বহুদিন রমণবিরত থাকলেও স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই প্রথম রমণে অতিশীঘ্র বিস্ফষ্টিরস ক্ষরণ করে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা তোমাদের জানিয়ে রাখি। বাঙালী তথা জগতের অধিকাংশ স্ত্রীলোকই মধ্যসম্ভববিস্থষ্টি ও চিরসম্ভববিস্থষ্টি শ্রেণীর অন্তর্গত, এবং বোধ হয় শতকরা একজন কি দু'জন শীঘ্রসম্ভববিস্থষ্টি বোলে গণ্য হোতে পারে। তাহোলে বুঝতে পার্চ্ছ যে, এদিক দিয়ে স্বভাবগতভাবেই পৃথিবীর অধিকাংশ স্ত্রীপুরুষের মধ্যে গরমিল রোয়েছে, এবং তার ফলে রমণীরাই বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হোয়েছে।

যাহোক, সাধারণভাবে বিচার কোরে দেখলে বোল্‌তে হয় যে, যে সকল স্ত্রীপুরুষের দুজনেই একশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, তাদের মিলন যেমন প্রগাঢ় তেমনি সুখাবহ হয়। বিস্থষ্টিকালের বিবেচনায় নিম্নলিখিত ছ'রকমের মিলনকে পণ্ডিতগণ অসঙ্গত ও বিসদৃশ বোলে মত প্রকাশ কোরেছেন।

(১) শীঘ্রসম্ভববিস্থষ্টি পুরুষের সঙ্গে চিরসম্ভববিস্থষ্টি নারীর মিলন।
(২) শীঘ্রসম্ভববিস্থষ্টি পুরুষের সঙ্গে মধ্যসম্ভববিস্থষ্টি নারীর মিলন।
(৩) মধ্যসম্ভববিস্থষ্টি পুরুষের সঙ্গে শীঘ্রসম্ভববিস্থষ্টি নারীর মিলন।
(৪) মধ্যসম্ভববিস্থষ্টি পুরুষের সঙ্গে চিরসম্ভববিস্থষ্টি নারীর মিলন।
(৫) চিরসম্ভববিস্থষ্টি পুরুষের সঙ্গে শীঘ্রসম্ভববিস্থষ্টি নারীর মিলন।
(৬) চিরসম্ভববিস্থষ্টি পুরুষের সঙ্গে মধ্যসম্ভববিস্থষ্টি নারীর মিলন।

শীঘ্রসম্ভববিস্থষ্টি পুরুষের সঙ্গে চিরসম্ভববিস্থষ্টি নারীর মিলনই সর্বাপেক্ষা আপত্তিকর ও অপ্রীতিজনক। এই দুই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত স্বামিস্ত্রীতে প্রায়ই মনের মিল হয় না। স্ত্রীরা গোড়া থেকে মনে মনে অসুখী হয়, এবং বহু ক্ষেত্রে চিররুগ্‌ণা হয়। অনেক সময় স্বামিস্ত্রীর মধ্যে ছোটখাটো বিষয় নিয়ে তর্কাতর্কি ঝগড়াঝাঁটি কথা-বন্ধ হয়। স্ত্রীর তরফ থেকেই বেশী রাগ, অভিমান, নাককান্না, অসম্ভব বায়না, পিত্রালয়ে যাবার বা আত্মহত্যা করবার ভীতিপ্রদর্শন; এবং ছেলেমেয়ে ও শাশুড়িননদদের সঙ্গে বিবাদ-ভৎসনাকে কেন্দ্র কোরে ঈশ্বরের নিকট সরোষে ও সরবে

মৃত্যুদানের প্রার্থনা (যথা, 'ভগবান, আমায় নাও, আর এ জ্বালা সহ্য হয় না'···ইত্যাদি)!

স্বামী বেচারী নিরুপায়; অনেক সময় সে কিল খেয়ে কিল চুরি করে। কোন কোন ক্ষেত্রে সে রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক আন্দোলনে সাগ্রহে যোগদান করে, নতুবা কোন গুরুর আশ্রমে গিয়ে দাড়ি রেখে মাছমাংস ছেড়ে অকালপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করে।···দু'হাজার বছর পূর্বে ঋষি বাৎস্যায়ন বোলে গিয়েছেন—"চিরবেগে নায়কেস্ত্রিয়োঽনুরজ্যন্তে, শীঘ্রবেগস্তু ভাবমনাসাত্মাবসানেঽভ্যস্থয়িত্যো ভবন্তি।" (সা, ১ম অ, ১৩)। এর অর্থ হোলো এই যে,—নায়ক চিরবেগ হ'লে স্ত্রীগণ অনুরঞ্জিত হয়, শীঘ্রবেগ হ'লে তারা বিস্থষ্টিসুখ না পেয়ে সুরতান্তে নায়কের প্রতি দ্বেষপরায়ণ হয়।

মিলনের কার্যকারক ও অন্তরায়

তাহোলে দেখ, স্ত্রীপুরুষের দৈহিক মিলন ও দেহভোগের মধ্য দিয়ে মানসিক মিলন ও ঐক্যস্থাপন কতগুলো কার্যকারকের ওপর নির্ভর করে! ইতঃপূর্বে সাধনদণ্ডের দৈর্ঘ্যপ্রস্থ ও সম্বাধের দৈর্ঘ্যপ্রস্থ হিসাবে তোমাদের কাছে পাঁচ রকম যন্ত্রযোগ বা রতিক্রিয়ার কথা বলেছি। উচ্চতররত ও নীচতররতের কথা বাদ দিলেও আরো তিন রকমের রত থাকে। এই তিন রকম রতকে হিসাবের আমলে আন্‌লে, এই দিক্ দিয়েও স্ত্রীপুরুষের ন' রকমের মিলন হোতে পারে। যথা, বড় সাধনদণ্ডের সঙ্গে বড় সম্বাধের সংযোজন, মাঝারি সাধনদণ্ডের সঙ্গে মাঝারি সম্বাধের সংযোজন, ক্ষুদ্র সাধনদণ্ডের ক্ষুদ্র সম্বাধের সংযোজন। আবার, বড় ধ্বজের সঙ্গে ক্ষুদ্র বা মাঝারি সম্বাধের সংশ্লেষণ, ক্ষুদ্র ধ্বজের সঙ্গে বড় বা মাঝারি নালীর সংযোগ·· ইত্যাদি।

তারপর, বেগ হিসাবে ন' রকমের সম্মিলন সম্ভব হোতে পারে। অবশেষে ইতিহর্ষ-লাভের বিভিন্ন সময় হিসেবে ন' রকমের

সম্মিলন হোতে পারে। চণ্ডাবেগা নারীর মধ্যে একশ্রেণীর এমন নারী আছে যারা অতি ঘন ঘন পুরুষাসঙ্গ এবং অপেক্ষাকৃত নির্দয় উপসৃপ্তক কামনা করে বটে, কিন্তু তাতে তারা শীঘ্র বিস্ফষ্টিলাভ করতে পারে। আবার মন্দবেগা নারীর মধ্যেও এমন নারী পাবে—যারা রতিবিরহ অল্পায়াসে সহ্য করতে পারে, কিন্তু একবার রতি আরম্ভ হ'লে ধূপের মতো ধীরে ধীরে জ্বোলে অতি-বিলম্বে ইতিহর্ষ লাভ করে। এই ত্রিবিধ শ্রেণীর ও বহুবিধ উপশ্রেণীর পরিবৃত্তি বা সংযোজন-বিযোজন কোরে সার রিচার্ড্ বার্টন্ স্ত্রীপুরুষের ২৪৩ রকমের দৈহিক মিলন বা'র কোরেছেন; বাৎস্যায়নের টাকাকার যশোধর পণ্ডিত ৭২৯ রকমের মিলন আবিষ্কার কোরে গেছেন। এইগুলির মধ্যে সামান্য কয়েকটি যৎপরোনাস্তি সুসমঞ্জস ও সুখদায়ক। অনেকগুলি মিলনের মধ্যে অল্পবিস্তর অসঙ্গতি থাক্‌লেও সেগুলি মোটামুটি সুখাবহ ও সংশোধনযোগ্য। বাকিগুলি নামেমাত্র মিলন—তাদের মধ্যে এত অসঙ্গতি যে, কোন রকমেই তার নিরসন হওয়া বোধ হয় সম্ভবপর নয়। তবে এইখানে মনের মিল অবশ্য অনেকখানি সাহায্য কোরতে পারে।

নারী গড়্‌পড়তা পুরুষের কামজীবনের ধারা সম্বন্ধে যতখানি খবর রাখে, পুরুষ গড়পড়তা নারীর কামজীবনের ধারা সম্বন্ধে তার অর্ধেক খবরও রাখে না। কয়জন পুরুষ জানে যে, নারীজাতির ধীর গতিভঙ্গীর সঙ্গে তার আহার ও বিহারের ছন্দ সমানভাবে তাল রেখে চলে? যোনিপ্রদেশ ব্যতীত নারীর দেহে আরো কতকগুলি কামজ কেন্দ্র আছে যেগুলি সম্যক উত্তেজিত না হোলে নারী সাধারণত শৃঙ্গারের জন্য উৎসুকও হয় না, প্রস্তুতও হয় না। সেইজন্যে তাদের প্রতপ্ত হোতে পুরুষ অপেক্ষা বেশ একটু বিলম্ব হয়। তার কাম ধাপে ধাপে ওঠে, ধাপে ধাপে নামে। এ সব কথা তোমাদের আগেই বলেছি, এবং একাধিকবার তোমাদের শোনাই এইজন্যে যে, এত পোড়ে-শুনেও

নারী সম্বন্ধে আকৈশোরের বদ্ধমূল ভ্রান্ত ধারণাগুলি এখনো তোমাদের অনেকের মনে বোধহয় অপত্রপুষ্পক হোয়ে বেঁচে আছে।

পণ্ডিত বাভ্রব্য বোলে গেছেন, "কুম্ভকারের কুলালচক্রের মতো—কুন্দনকারের ভ্রমিযন্ত্রের (lathe) মতো মেয়েদের কামাবেগ প্রথমটা থাকে মৃদু, ক্রমশ সে শক্তিসঞ্চয় কোরে চূড়ান্ত গতিশিখরে পৌঁছোয়। তারপর বিস্ফষ্টিরস ক্ষরণ করার সঙ্গে সঙ্গে তারা যখন তৃপ্তির সীমায় পৌঁছোয়, তখন তাদের কামাবেগ ভ্রমিযন্ত্রের মতোই আসে ধীরে ধীরে শীতল হোয়ে।"

বাভ্রব্যের এই চিত্রকে বাৎস্যায়ন পূর্ণাঙ্গ কোরে তুলেছেন এই কয়টি কথা সংযোজন কোরে—"পুরুষের প্রথম রতি যেমন প্রচণ্ড তেমনি দ্রুত নিষ্পন্ন হয়, কিন্তু অল্পসময়ের ব্যবধানে পরবর্তী রতি দীর্ঘস্থায়ী হয়। স্ত্রীলোকের কিন্তু এর বিপরীত রীতি। প্রথম রতিতে তার কাম থাকে দুর্বল এবং ধীরারোহী; ঐ সময় তার ইতিহর্ষ লাভে বিলম্ব ঘটে (পুরুষ তাড়াতাড়ি আসঙ্গ নিষ্পাদন কর্লে সে ইতিহর্ষ লাভের সুযোগই পায় না)। কিন্তু একই রাত্রিতে পশ্চাদ্বর্তী দ্বিতীয় সম্মিলনে তার আবেগ জাগে তীব্রতরভাবে এবং সে অপেক্ষাকৃত শীঘ্র চরমতৃপ্তি উপলব্ধি করে। এরকম প্রায়ই ঘটতে দেখা যায় যে, স্ত্রীলোক তার কামনার উচ্চতম শিখরে আরোহণ করবার পূর্বেই অথবা বিস্ফষ্টিরস ত্যাগ করার পূর্বেই পুরুষলোক স্খলন কর্‌ল।"...

সেইজন্যে আমরা যে সকল পুরুষ অপেক্ষাকৃত শীঘ্র স্খলন করে, তাদের উপদেশ দিই একই নিশীথে অল্প সময়ের ব্যবধানে দু'বার সম্ভোগ করতে এবং পরবর্তী কয়েকটি দিন সংযম পালন করতে।...

যাক্, এক কথায় গুছিয়ে বোলতে গেলে বোলতে হয় যে,—স্ত্রীলোকের আবেগ জাগে ধীরে, অনুভূতি আসে পরে, তৃপ্তি আসে শেষে, আবেগ যায় মন্থরপদে। বীণাযন্ত্র বাজাবার পরও কিছুক্ষণ যেমন

সুরের রেশ রণিত হোতে থাকে তার তারে তারে, তেমনি নারীর কামাবেগও প্রশমিত হবার পরও খানিকক্ষণ তার আবেশাবশেষ থাকে জেগে; তারপর সে আস্তে আস্তে আসে জুড়িয়ে। তাই প্রাচ্যদেশ-সমূহের আচার্যগণ পমামর্শ দিয়েছেন—আসঙ্গের পর তাড়াতাড়ি বিযুক্ত না হোতে এবং রত্যন্তে স্ত্রীকে ক্ষণিকের জন্যেও একটু আদর-আপ্যায়ন করতে; যেন সে কোনমতেই এই প্রবাদবাক্যটা না মনে আনে—'কাজের সময় কাজী, কাজ ফুরোলেই পাজী।'

দৈহিক অসামঞ্জস্য দূরীকরণের কৃত্রিম উপায়

যুবাবয়সে ও প্রৌঢ়কালে ধ্বজের কিয়ৎ পরিমাণে আয়তনবৃদ্ধি, দৃঢ়তা-লাভের ক্ষমতা, সম্ভোগের স্থায়িত্বকাল-বৃদ্ধি এবং স্ত্রীলোকের সম্বান্ধের শ্লথতা বা প্রশস্ততা-হ্রাসের জন্যে সেকালের প্রায় সকল সভ্যদেশেই নানা যৌগিক ব্যায়াম, আঙ্গিক বিন্যাস-পদ্ধতি, ঔষধ, মালিশ, তাগা, মাদুলি, তাবিজ, মন্ত্রতন্ত্র প্রভৃতি আবিষ্কৃত ও উদ্ভাবিত হোয়েছিল। আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রে, য়ুনানী চিকিৎসাশাস্ত্রে, মিশর, আরব ও ইরানের চিকিৎসাগ্রন্থে সম্ভোগসুখ প্রগাঢ় করার নানাবিধ উপায় ও ঔষধের উল্লেখ ও ব্যবহারবিধি আছে। আমাদের দেশে বেদে, পুরাণে, চরক থেকে চক্রদত্ত পর্যন্ত বৈদ্য মহাজনদের চিকিৎসা-গ্রন্থে, কামসূত্র, অনঙ্গরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থে আমরা বহুবিধ বৃষ্য, বাজীকরণ ও রসায়নের প্রস্তুতিপদ্ধতি ও ব্যবহারবিধির সন্ধান পাই। সেগুলির সামান্য একটু নমুনা অধ্যাহার করাও এই ক্ষুদ্র পুস্তকে সম্ভবপর হবে না।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের ল্যাতিন, মিশরীয় ও টিউনিসের চিকিৎসাশাস্ত্রে নারীর বক্ষ ও সম্বাধের সৌন্দর্যবৃদ্ধি করার কতকগুলি মুষ্টিযোগ দেওয়া আছে। এগুলির বেশীর ভাগই আজ্‌গুবি ও অকার্যকর বোলে প্রতীতি জন্মালেও বাকিগুলি আদৌ কার্যকরী কিনা—তা আজকালকার

বৈজ্ঞানিকরা কেউ পরীক্ষা কোরে দেখেননি। নানারকম গাছের পাতা ও শিকড়ের রসের এবং ফট্‌কিরির সঙ্কোচক-গুণের কথা প্রায় সর্বদেশের প্রাচীন শাস্ত্রে উল্লেখ করা হোয়েছে। ফট্‌কিরির সঙ্গে অন্য দু'তিন রকমের ওষুধ মিশিয়ে ফলপ্রদ নালীসঙ্কোচক হিসাবে আজকালকার কোন কোন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ব্যবস্থা প্রদান করেন। কোন কোন বিলাসিনী মুখে-মাখার "স্নো" প্রয়োগ কোরেও সম্বাধের আংশিক সংকোচনে সফলকামা হন—শুনতে পাই। ইন্দ্রিয়বৃদ্ধি ও রতিশক্তি-বর্ধনের কয়েকটি ভালো ভালো সেবনীয় ও আন্তঃক্ষেপনীয় (injectible) ওষুধ কয়েক বৎসর যাবৎ প্রচলিত হোয়েছে। তবে এগুলির বেশীর ভাগই স্থায়ী ফলদায়ক নয় এবং সর্বক্ষেত্রে সমান কার্যকরীও নয়।

শয়নকক্ষ ও পরিবেশ

যাহোক্, এইবার আমি প্রাচীন মহাজনদের প্রদত্ত ও আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের সমর্থিত কতকগুলি উপদেশ দিতে চাই সম্প্রয়োগের স্থান, কাল, পাত্র সম্বন্ধে। হিন্দু কামশাস্ত্রকারগণ সম্ভোগকে আগাগোড়া মনোরম ও আবেশময় করার জন্যে সর্বপ্রথম সুপরিবেশ সৃষ্টির বিধান দিয়েছেন। কল্যাণমল্ল এক জায়গায় বোলেছেন, "বাড়ির মধ্যে যেখানি সব চেয়ে সুন্দর ঘর, সেইখানি নির্বাচন কোর্‌বে; ঘরখানা যেন ভালো কোরে চুনকাম করা হয়। এর সুদৃশ্য দেওয়ালগুলি চারু চিত্র ও অন্যান্য সামগ্রী দিয়ে এমনভাবে সাজাবে যে, তার ওপর দৃষ্টি বারংবার পড়্‌লেও চক্ষু শ্রান্ত হবে না। বংশী, বীণা জাতীয় কয়েক প্রকার বাদ্যযন্ত্র থাক্‌বে ঘরে। তাক্‌গুলিতে মুখরোচক জলযোগ ও বলকারক পানীয়ের উপকরণ থাক্‌বে সজ্জিত—কিছু রকমারি ফল, তাম্বুল, দুগ্ধ প্রভৃতি। আলমারিগুলিতে গোলাপজল, গন্ধসার, প্রসাধনসামগ্রী, গীতিকবিতা, কাব্য, পৌরাণিক গাথা, নাটক, বহুবর্ণ চিত্রসংযুক্ত প্রেমের কবিতা ও

পুঁথি থাক্‌বে ঠাসা। দেওয়ালে যথেষ্ট সংখ্যক দর্পণ ও দেওয়ালগিরি টানানো থাকে যেন।"...

তারপর, পালঙ্ক কি রকম হবে, গদি-তোষক-বালিস কি রকম হবে, কি রকম চাঁদোয়া মাথার ওপর ঝুল্‌বে—প্রাচীনেরা সব জিনিসেরই উল্লেখ কোরেছেন। ঘরে পুড়্‌বে ধূপ-ধূনা-লোবান্‌-মুশব্বর-অগুরু-চন্দন। শয্যায় ও পুষ্পাধারে থাক্‌বে নানাজাতীয় সুগন্ধি ফুল। কোন্‌ কোন্‌ ফুল কামনার উদ্রেক করে তারও ফিরিস্তি দিয়েছেন প্রাচ্য মহাজনেরা। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হাস্নাহানা, রজনীগন্ধা, জুঁই, চামেলি, কাঁটালি চাঁপা, বেল, গন্ধরাজ, হেনা, চন্দ্রমল্লিকা প্রভৃতি। ফুলের মালা গলায় পরা, ফুলের মুকুট মাথায় পরা, কদম-কেয়া-লোধ-ফুলের রেণু বিছানায় ছড়িয়ে দেওয়া, ফুলের বোঁটার রস দিয়ে ঠোঁট রাঙানো—সেকালের অতি সাধারণ গৃহস্থ-কুলবধূদেরও পতিসম্মিলনের পটভূমিকা ছিল। ওমর হালেবি তাঁর কেতাবের একজায়গায় বল্‌ছেন, "জল, ব্যায়াম ও প্রার্থনার মতোই গন্ধদ্রব্য মানুষের সুখ ও স্বাস্থ্যের জন্যে অনিবার্য, অত্যাবশ্যক।"...

কিন্তু আজকাল সচ্ছল পরিবারেও পতিপত্নীর শয়নকক্ষে এ আবেশ-মধুর আবহাওয়ার সৃষ্টি করা বড় সহজসাধ্য নয়। ধন-কুবেরের গৃহ ছাড়া এত ফুল এত গন্ধদ্রব্যের ছড়াছড়ি এবং গৃহসজ্জার আড়ম্বর সম্ভবপর নয়। সম্প্রতি দুরন্ত অর্থকষ্ট ও মুদ্রাস্ফীতির তাড়নায় পল্লীর পুষ্পকুঞ্জে এখন পেঁপে আর পালম্‌ শাকের চাষ হোচ্ছে, নগরের ফুলওয়ালারা খরিদ্দারের অভাবে ফলের ঝুড়ি মাথায় কোরেছে। প্রশস্ত ও মনোহর কক্ষ এখন সুদুর্লভ বস্তু। জনবৃদ্ধির চাপে বহু গৃহের একখানা কক্ষকে দুই-তিন খণ্ডে ভাগ করা হোয়েছে; বহু পরিবারে পৃথক কক্ষের অভাবে গতপ্রায়-যৌবন পুত্রদের বিবাহ স্থগিত রাখা হোয়েছে। নবীন দম্পতির রতি-মন্দিরের ছন্দোভঙ্গ হয়েছে বিংশ শতাব্দীর একচক্ষু অর্থদানবের নিষ্ঠুর

পদাঘাতে! প্রাচীনদের এসব উপদেশ এখন প্রায় অচল। সুতরাং এ নিয়ে আর বেশী বাড়াবাড়ি বা পীড়াপীড়ি করব না।

কিন্তু পরিবেশের আর একটা সহজসাধ্য ব্যক্তিগত দিক্‌ আছে। সেটা হোলো ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা। এ সম্বন্ধে মহাজনদের খুব বেশী উপদেশ দেবার দরকার হয়নি এইজন্যে যে, ভারতবর্ষ নদীমাতৃক গ্রীষ্মপ্রধান দেশ; এখানকার লোকে নিত্য তৈলমর্দন, স্নান, গাত্রমার্জন আবহমানকাল সমানভাবে কোরে আসছে; শৌচকার্যে তারা স্বতই সিদ্ধহস্ত, দন্তধাবনে তারা জনে জনে সুপটু। শীতপ্রধান দেশ ও মরুভূমির অধিবাসীরা এ বিষয়ে ভারতবাসীর বহু পশ্চাতে। এমন কি, দার্জিলিং, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত প্রদেশ, নেপাল, হিমাচল প্রদেশ, কাশ্মীর প্রভৃতি অঞ্চলের লোকের শুচিতাবোধ সমতল নদীমাতৃক অঞ্চলের লোকেদের চেয়ে অনেক কম।

আগেকার মা ও ঠাকুর্মারা মেয়েদের শিক্ষা দিতেন ঋতুস্রাবকালে কি কোরে শুচিতা রক্ষা কোরতে হয়, মূত্রত্যাগের পর কিভাবে জলশৌচ কোরতে হয়, কিভাবে জঘন প্রদেশকে নিজের বদনমণ্ডলের মতোই শুচি রাখ্‌তে হয়। আগেকার বউরা রাঁধতেও জান্‌ত যেমন, চুল বাঁধতেও জান্‌ত তেমনি; তারা ধানও ভান্‌ত, আলতাও পর্‌ত। সম্প্রতি রুজ-পাউডার-স্নো আর সাবানের যুগে মেয়েরা হাতের ডগা ও মুখের দিকে অত্যধিক নজর দিতে গিয়ে অন্যান্য অঙ্গগুলোর অযত্ন কোর্‌তে শিখ্‌ছে। ভারতের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত বহু চিকিৎসক ও ধাত্রী অভিযোগ করেন—আজকালকার বহু শিক্ষাভিমানিনী কুমারী ও বধূদের গোপনপ্রদেশ আশাসুরূপভাবে নির্মল থাকে না। পতিপ্রবরদের তো কথাই নেই। তাঁদের দৌড় শেভিং স্টিক্‌ ও সেফ্‌টি রেজর অবধি!

জঘনপ্রদেশীয় পরিচ্ছন্নতা

রতিশৈল-প্রদেশে পরিমিত কেশ রাখার সার্থকতা আছে, কিন্তু তাই বোলে বেশী পরিমাণে দীর্ঘকেশ জন্মাতে দেওয়া কোনক্রমেই

উচিত নয়। অন্ততপক্ষে বৎসরে তিন-চারবার ছাঁটা ও একবার ক্ষৌরক্রিয়া করা স্বাস্থ্যধর্মের দিক দিয়ে খুবই সঙ্গত। লোমনাশকগুণসম্পন্ন নানারকম গাছগাছড়ার রস ও খনিজ পদার্থের ব্যবহার সেকালের স্ত্রীলোকদের মধ্যে গোপনে প্রচলিত ছিল। এসিয়া মাইনর, ইরান্, ভারত, অ্যালজেরিয়া, টিউনিস্, স্পেন, রোম, গ্রীস প্রভৃতি দেশে অতি প্রাচীনকাল থেকে জঘনপ্রদেশীয় রোমরাজী নিয়মিতভাবে নির্মূল করার প্রথা ছিল। ইহুদিদের মধ্যে এ প্রথা কখনো লোকপ্রিয় ছিল না, কারণ এটা তাদের শাস্ত্রসম্মত আচার নয়। উত্তর-ইউরোপের বহুদেশে অজস্র রোমরাজী সঞ্চয় করা আজ পর্যন্ত একটা ফ্যাশনের মধ্যে পরিগণিত।

অধিকমাত্রায় লোম সঞ্চিত থাক্‌লে স্থানটি অপরিচ্ছন্ন থাক্‌বার অবসর ঘটে, সর্বদা সংবৃত থাকায় অত্যন্ত ঘর্মাক্ত হয় এবং নানারূপ চর্মরোগ উৎপাদনের কেন্দ্র হয়। আরবী কামশাস্ত্রকারগণ এই স্থানটিকে নির্লোম রাখ্‌বার উপদেশ দিয়েছেন, যদিও একেবারে নির্লোম রাখা এবং ঘন ঘন নির্লোমিত করাও বিজ্ঞানানুমোদিত নয়। বাহুসন্ধিনিম্নস্থ কক্ষদেশ সম্বন্ধেও ঐ এক নিয়ম খাটে। সুন্দরী ও শিক্ষাভিমানিনী যুবতীকে মনে রাখতে হবে, তার নিজের কাছে তো বটেই, তার প্রেমিকের কাছেও, তার প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গটি সমান যত্নের—সমান আদরের সামগ্রী। রাগোদ্দীপ্ত দয়িতের ব্যগ্র করোপস্পর্শ ও ওষ্ঠস্পর্শের জন্যে সংগুপ্ত স্থানকেও নিত্য প্রস্তুত রাখ্‌তে হয়; যেন কোন ক্লেদ কোন দুর্গন্ধ তার উৎসাহকে স্তিমিত না করে।

দন্তধাবন ও একত্রশয়ন

দন্তধাবন সম্বন্ধেও প্রাচীন মহাজনগণ বারংবার উপদেশ দিয়েছেন। স্বামী বা স্ত্রীর মুখের ও নিঃশ্বাসের খারাপ গন্ধ দুজনের তরুণ প্রেমের পথে জন্মের মতো কাঁটার বেড়া দিয়েছে—এমন ঘটনা আমরা শত শত জানি। আজকালকার মেয়েদের অনেকেরই পান্‌সে, অপরিচ্ছন্ন, অবিন্যস্ত দাঁত;

মাড়িতে পুঁজ। অধিকাংশ শহরবাসী তরুণতরুণীদের মধ্যে সস্তার টুথ-পেস্ট ও শক্ত টুথ-ব্রাশ্ ব্যবহারের রেওয়াজ দাঁড়িয়ে গেছে। শতকরা পাঁচ থেকে দশটি টুথপেস্ট্ সত্যি দাঁতের বা মুখাভ্যন্তরের কিছু উপকার করে বটে, কিন্তু সেগুলো দামী বোলে অনেকের নাগালের বাইরে। তার ওপর হার্ড ব্রাশ মাড়ির সর্বনাশ করে এবং অকালে দন্তপাটিকে শ্লথমূল কোরে দেয়। নরম বা মাঝামাঝি-শক্ত ব্রাশ প্রত্যহ ব্যবহারের পর কোন ধূলিবর্জিত স্থানে জীবাণুশূন্য অবস্থায় রাখার নিয়ম; মাঝে মাঝে ফুটন্ত গরমজল ও সাবান (বা ডেটল্) দিয়ে পরিষ্কার করতে হয়। মামুলি টুথব্রাশ হাজার পরিষ্কার রাখলেও ৩ মাসের পর একেবারে অকেজো হয়; কাজেই ফেলে দিতে হয়। এত সব ল্যাঠা কেউ পোহাতে চায় না।

রাত্রিতে শয়নের পূর্বেও একবার দাঁত মাজার নিয়ম; সে নিয়ম স্বাস্থ্যান্বেষী ও দাম্পত্য-সুখাভিলাষী স্ত্রীপুরুষ অনেকেই মানে না। দাঁতন ও দেশী দন্তমঞ্জনের গুঁড়া ব্যবহার গরিবের মধ্যে এখনও প্রচলিত আছে বোলে তাদের মধ্যে দাঁতের ব্যাধির প্রকোপ কম। আধুনিকারা লিপস্টিক্ লাগায়, চিউইং গাম্ চিবোয়, পান খায় না। তাদের অনেকেরই নিঃশ্বাস ও মুখবাস শুধু অপ্রীতিকর নয়—অসহনীয়। তাদের মুখচুম্বন আমন্ত্রণ জানিয়ে প্রেমিককে কঠোর অগ্নিপরীক্ষায় ফেলে।... পরিমিত মাত্রায় পাণ বা পাণের মশলা খাওয়া স্বাস্থ্যের ও কান্তিরসের দিক দিয়ে মোটেই অবাঞ্ছনীয় নয়। তবে দিনে-রাতে ৩।৪টের বেশী হোলে এবং ওর সঙ্গে জর্দা-দোক্তার রসান্ দিলে নিশ্চিত হিতে-বিপরীত হবে। এক ফোঁটা দামী কিমাম অথবা এক ছিটে এলাচ-দারুচিনি-জৈত্রী-দেওয়া দুটো বা বড় জোর তিনটে পান প্রত্যহ খেতে দিতে আমি ক্বচিৎ আপত্তি করি।

মুসলমান মহাজনগণ প্রায় সকলেই একবাক্যে স্বামিস্ত্রীকে পৃথক শয্যায় শয়ন কোরতে উপদেশ দিয়েছেন। 'জেনান্-নামে'র গ্রন্থকার বোলেছেন যে, খসম-জরুর মধ্যে—প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে যদি বিচ্ছেদ

ঘটাতে চাও, তাহলে কিছুদিন তাদের এক-শয্যায় শুতে দাও, ভোরবেলা পরস্পরকে পরস্পরের দূষিত নিঃশ্বাস গ্রহণ করতে দাও, তাদের ক্লেদাক্ত মুখ—অধৌত দেহ দেখতে দাও। ব্যস্।...সেইজন্যে তাঁরা স্ত্রীলোককে চিরকাল স্বামীর জাগার আগে শয্যাত্যাগ কোরে স্নান-শৌচক্রিয়াদি সমাপন কোরে নিতে বলেছেন।....এদেশের বহু পল্লীবধূ এখনো এ নিয়ম নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে।

নবোঢ় দু'জনের পক্ষে আলাদা শোওয়া অতিশয় কষ্টকর হোলে বিয়ের পর এক বছর পর্যন্ত—বড় জোর একটি সন্তান না হওয়া পর্যন্ত একশয্যায় শয়ন অনুমোদন করতে পারি। তারপরে নৈব নৈব চ।...

নারী কখন অন্তরতে তৃপ্ত হয়

কল্যাণমল্ল ও অন্যান্য হিন্দু লেখকগণ এমন বারোটি পরিস্থিতির কথা বোলে গেছেন—যে সময় নারীরা সহজে পুরুষের উপসর্পণে জাগরিতা হয় এবং অল্পস্থায়ী অসঙ্গে ইতিহর্ষ লাভ করে। যথা,—

(১) কায়িক পরিশ্রমে বা পথপর্যটনে ক্লান্ত অবস্থায়।

(২) প্রেমিকের নিকট হোতে দীর্ঘকাল বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকার পর পুনর্মিলন-রাত্রিতে; প্রেমিকের সঙ্গে কলহান্তরিতা হবার পর।

(৩) গর্ভের প্রথম অবস্থায় (৪ মাস কিংবা তারো কিছুদিন পর পর্যন্ত)।

(৪) সন্তানপ্রসবের একমাস (কিংবা দেড় মাস) পরে।

(৫) যখন মনটা বিস্বাদ ফাঁকা-ফাঁকা মনে হয়, যখন সময় আর কাটতে চায় না, যখন গা ম্যাজ্‌ম্যাজ্ করে, যখন ঘুম পায় অথচ আসে না।

(৬) জ্বরজারি কিংবা দীর্ঘকালস্থায়ী কোন ব্যায়রাম হোতে মুক্তিলাভ করার পর।

(৭) যখন তারা পারিবারিক বা সামাজিক প্রভাবের বাইরে

এসে খানিকক্ষণের জন্যে বেপরোয়া মুক্তির আস্বাদ নিতে চায় অথবা সজ্ঞাবিলাসে ও সলজ্জ লীলাবিভ্রমে বহুক্ষণ কারো সঙ্গে লুকোচুরি-খেলা কোরে ধরা দেয়।

(৮) উৎসব উপলক্ষে যখন আনন্দের উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠে। [যেমন নিজের আত্মীয়কুটুম্বের বিবাহাদি উপলক্ষে, ফুলসজ্জার রাত্রিতে আড়াল থেকে নবদম্পতির প্রথম সম্ভাষণ শোনা বা প্রথম-সম্মিলন দেখার পর... পিত্রালয় থেকে কোন শুভ সংবাদ পাবার পর...স্বামীর কাছ থেকে কোন মূল্যবান অথচ পছন্দসই উপঢৌকন পাবার পর...ইত্যাদি]।

(৯) মাসিক ঋতুস্রাবের অব্যবহিত পূর্বে কিংবা পরে *।

(১০) আগে-থেকে-উপচার-প্রাপ্তা প্রবুদ্ধযৌবনা কুমারী যখন কিছু-কালের পরিচিত প্রেমিকের প্রথম আসঙ্গ লাভ করে।

(১১) সারা বসন্তকালে। [শরৎকালেও প্রায় সমান অবস্থা।]

(১২) প্রবল বর্ষায় ও বজ্রঝঞ্ঝায়। [যুদ্ধ ও দাঙ্গা-কালেও প্রায় ঐ এক অবস্থা।]

এই দ্বাদশ সংখ্যাকে ইচ্ছে কর্লে আরো বাড়ানো যায়।...উপরে ও নীচে বন্ধনীর মধ্যে যে মন্তব্যগুলি দেওয়া হোলো, এবং পরে হবে সেগুলো অবশ্য আমার নিজের।...

নিষিদ্ধ স্থান

কোক্কক ও কল্যাণমল্ল বিশ্রম্ভ ও রমণের স্থানকালপাত্র সম্বন্ধে কতকগুলি কড়া নিয়ম স্থাপন কোরে গিয়েছেন; এগুলির মধ্যে কতকগুলি

* আধুনিককালের বৈজ্ঞানিকগণ ডুয়োদর্শন-দ্বারা বলীয়ান হোয়ে বল্‌ছেন যে, বহু নারী স্রাবের ৩।৪ দিনও অতি সহজে কামপীড়িত হয়; তা'ছাড়া ঋতুস্রাব আরম্ভের তেরো-চোদ্দ দিন পরও কোন কোন নারী নমনীয় ও রমণীয় হয়। ঐ সময়টিতেই তাদের দুটি অণ্ডাশয়ের একটি (ovary) থেকে একটি পরিপক্ক অণ্ডাণু নির্গত হয়। অণ্ডাণু-শুক্রাণুর মিলনেই গর্ভোৎপাদন হয়।

অবশ্য এই বস্তুসর্বস্ব যুক্তিবাদের যুগেও অসংশয়ে পালন করা চলে। এই নিয়মগুলি গড়্‌তে গিয়ে তাঁরা সুকুমারবৃত্তি, সৌন্দর্য-রসতত্ত্ব ও সামাজিক শালীনতাবোধকে দুজনের দৈহিক প্রয়োজনীয়তা ও বিচারান্ধ মনের ব্যগ্রতার ওপরে স্থান দিয়েছেন। চোদ্দটি নিষিদ্ধ স্থানের তালিকা থেকে আমরা সাতটি মাত্র বেছে এখানে উল্লেখ কোরে যাচ্ছি। এগুলির অধিকাংশ তোমরা মনে রাখলে খুশী হব।

(১) নদী বা নির্ঝরিণীর উপকূলে। (২) উপাসনা-স্থানের চাতালে, ধারে-কাছে। (৩) পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন, বৃদ্ধ ব্যক্তিগণের সান্নিধ্যে। (৪) কোন শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তির শ্রুতি ও দৃষ্টি-গোচরে (বা তাদের সন্দেহ উদ্রিক্ত কোরে)। (৫) দুর্গকক্ষে, দুর্গপ্রাকারে, প্রহরীনিবাসে, থানায়, কারায়, শিবিরে ইত্যাদি। (৬) রাজপথে, গভীর অরণ্যে, মুক্তপ্রান্তরে বা ভ্রমণোদ্যানে। (৭) কোন সমাধিস্থানে, শ্মশানে।

নিষিদ্ধ কাল

(১) দিবাভাগে (রাত্রিকালে সম্মিলনের সুবিধা থাকা সত্ত্বেও; বিশেষভাবে দ্বিপ্রহরের মধ্যে কদাচ নয়)।

(২) হেমন্তের প্রথম ভাগে ও দারুণ গ্রীষ্মের সময়।

(৩) একপক্ষের অসুস্থতা-কালে।

(৪) কোন পূজা-পর্বদিনে, কোন বিশেষ মহাপুরুষের আবির্ভাব বা তিরোভাব-উৎসবে, উপবাস পালন (বা রোজা রাখার) কালে।

(৫) অত্যন্ত শ্রমসাধ্য কার্য করবার পর অথবা দীর্ঘপথ ভ্রমণ-কালে।

(৬) সন্ধ্যার সময় (৫টা থেকে ৯টার মধ্যে)।

সম্প্রয়োগের আরো বিধিনিষেধ

তোমাদের আগেই বোলেছি যে, অনেকের ধারণা—মেয়েরা রতি-ক্রিয়ার শেষসময়ে ঠিক পুরুষের শুক্রের মতো বেশ কয়েক ফোঁটা রস নালীর অভ্যন্তর থেকে সবেগে বিক্ষেপ করে। এখনো কোনো কোনো

হেকিমী ও কবিরাজী বইতে বেপরোয়াভাবে ঘোষণা করা হয় যে, পুরুষের এক ফোঁটা শুক্র ও মেয়েদের এক ফোঁটা রক্ত জরায়ুর মধ্যে বড়ি পাকিয়ে ভ্রূণের সৃষ্টি করে।...আর একটা অমূলক বিশ্বাস আপামর-সাধারণ ছাড়াও কোন কোন চিকিৎসকের চিত্তে বাসা বেঁধে আছে। সেটা হ'ল এই।—মেয়েরা যখন রমণে ইতিহর্ষ লাভ করে, তখন তাদের জরায়ুর মুখ মাছের হাঁয়ের মতো খুলে যায়, তখন পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ তার মধ্যে সহজে প্রবেশ করে এবং জরায়ুর ওষ্ঠবৎ প্রান্ত তাকে সজোরে কাম্‌ড়ে ধরে।...এটাও কিন্তু স্রেফ্ গঞ্জিকা।...

আসল কথা হোল এই যে, ইতিহর্ষের সময় মুখ-সমেত জরায়ুর সমস্ত দেহটাই পিঠের দিকে একটু নেমে যায়; তার ফলে যোনিনালীর পিছনের পকেট্‌টা (যেখানে সাধারণত সাধনাগ্র গতায়াত করে) যায় ছোট হোয়ে; কাজেই সাধনাগ্র সঞ্চাপিত হয়। তারপর, চরমানন্দের সময় মেয়েদের জরায়ুমুখ ঈষৎ খোলে বটে, কিন্তু তার মধ্যে একটা বড় ছুঁচ—বড় জোর একটা কোড়ে আঙুল প্রবেশ কোর্‌তে পারে। প্লেতো যেদিন জরায়ুর ক্ষুধিত পশুর সঙ্গে তুলনা দিলেন, সেইদিন থেকে পৃথিবীর জ্ঞানিসমাজ বিশ্বাস কর্‌তে আরম্ভ কোরেছিল যে, বহু কামুকী স্ত্রীলোক জরায়ুমুখ বিস্ফারিত কোরে ও সাধনাগ্র কামড়ে ধোরে অতিরিক্ত মাত্রায় পুরুষের শুক্র শুষে নেয়। এখনো অনেকের হাস্যোদ্রেককর প্রতীতি আছে যে, নালীর অভ্যন্তরে বীর্যক্ষেপ কর্লে তার কিয়দংশও তৎক্ষণাৎ জরায়ুর মধ্যে এবং সেখান থেকে পেটের মধ্যে চোলে যায়।...

যাক্, এ নিয়ে আর বেশী আলোচনার প্রয়োজন নেই। আমার অন্য বইগুলির পাঠকপাঠিকারা এই সকল ভ্রান্ত বিশ্বাসের বশীভূত নয়—এ বিশ্বাস আমি রাখি। এখন মহাজনদের দ্বারা পুরুষজাতিকে প্রদত্ত কয়েকটি গরিষ্ঠসাধারণ ও মূল্যবান উপদেশ (স্থানে স্থানে নিজের টিপ্পনী সহযোগে) শুনিয়ে দিয়ে, আজকের লম্বা বৈঠক শেষ কোরতে চাই।—

(১) দণ্ডায়মান অবস্থায় রতিরত হওয়ার অভ্যাস পরিত্যাগ কোরো; এই অভ্যাস জানুসন্ধিতে বাত, স্ফীতি ও নার্ভ্‌জনিত স্বয়ংকম্পন আনয়ন কোরতে পারে।

(২) বীর্যক্ষেপের পর পুরুষেন্দ্রিয় বেশীক্ষণ অন্তর্নিবিষ্ট রাখ্‌বে না। (২।১ মিনিট রাখলে কোন ক্ষতি নেই; অথবা যতক্ষণ কঠিন থাকে, ততক্ষণ অপর পক্ষের প্রয়োজনে রাখা চোলতে পারে।)

(৩) ক্রিয়ার অব্যবহিত পরে ঠাণ্ডাজল দিয়ে ইন্দ্রিয়স্থান ধৌত কোরো না। [থার্মোফ্লাস্কে রক্ষিত ঈষদুষ্ণ জল দিয়ে ধৌত করা অবাঞ্ছনীয় নয়। বর্ষা, হেমন্ত ও শীতকালে একেবারে না ধুয়ে কোমল বস্ত্রখণ্ডে মোছাই সঙ্গত। কারো যদি স্থানীয় কোন স্পর্শক্রামী রোগ থাকে অথবা স্ত্রীর নালীমধ্যে অন্তত ঋতুশোণিতের চিহ্ন থাকে, তাহলে ৪।৫ মিনিট পরে সাবানজলে ধোওয়া যুক্তিযুক্ত।]

(৪) রতিক্রিয়ার পর কোন দৈহিক বা মানসিক শ্রম না করাই উচিত। কিছুক্ষণের জন্যেও বিশ্রাম বা নিদ্রা দুজনের পক্ষেই স্বাস্থ্যপ্রদ।

(৫) একরাত্রিতে বহুবার অভিগমন ও বহুদিনব্যাপী নিত্য অভিগমনে স্বাস্থ্য নিশ্চিত নষ্ট হয়। এতে অচিরে বা বিলম্বে নিম্নলিখিত উপসর্গগুলি দেখা দিতে পারে—(ক) ইন্দ্রিয়োত্থানশক্তির হ্রাস ও বিনাশ, (খ) প্রজননশক্তির অভাব, (গ) দৃষ্টিশক্তির হ্রস্বতা, (ঘ) পেশী ও নার্ভের বলহীনতা, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অবশতা বা কম্পন (ঙ) অধ্যবসায়, একাগ্রতা, শ্রমসাধ্য কর্মে অক্ষমতা, (চ) হৃদিদৌর্বল্য, শ্বাসকষ্ট, অম্লাজীর্ণ, শ্বাসযন্ত্রের ক্ষয় ইত্যাদি। কিছুদিন ধোরে যে পুরুষ বহুসম্ভোগ করে, শেষে তার এমন দশা হয়, 'যেন সে উড়্‌তে চায়—উড়্‌তে পারে না, যেন কারো পেছনে ছুটতে চায়—ছুটতে পারে না। যেন সর্বদাই তার মাথার ওপর গুরুভার চাপানো—যার চাপে সে নুয়ে নুয়ে পড়ে'।...

(৬) যে পুরুষ একবার উপভোগের পর বিশ্রাম না নিয়ে এবং আসঙ্গিক নিঃস্রাব পরিষ্কার না কোরেই দ্বিতীয়বার উপভোগে প্রবৃত্ত হয়, তাদের ইন্দ্রিয় ক্রমশ নিস্তেজ ও ভোগের অনুপযুক্ত হোয়ে পড়ে।

(৭) স্নানের সময়, স্নানের ঠিক্ পরেই এবং গুরুতর মদ্যপানের পর রতিক্রিয়া অত্যন্ত স্বাস্থ্যহানিকর। [শেখ নেফ্‌জাউই সত্য সত্যই বলেছেন, উপভোগের মাত্রা নির্ভর করে জঘন-প্রদেশের উত্তাপের ওপর। স্নানের সময় বা পরে এই স্থান আশানুরূপ তাপসঞ্চয় করতে পারে না, কাজেই আনন্দ-ভোগ ও দানের উপযোগী হয় না।]

(৮) অর্থ বা কোন বস্তুগত লাভের প্রত্যাশায় কোন বয়োবৃদ্ধা বা বিগতযৌবনাকে কখনো উপভোগ করবে না,—হোক্-না-কেন সে কারুনের (বাইবেলোক্ত 'কোরা'র) মতো অগাধ ঐশ্বর্যশালিনী। বৃদ্ধারমণ বিষাক্ত খাদ্য।

(৯) গুরুভোজনের পর, কঠিন রোগের উপশম-অবস্থায়, অতি শীতে বা অতি গ্রীষ্মে স্ত্রীসঙ্গ যথাসাধ্য বর্জন করবে।

(১০) সম্প্রয়োগ-কালে গায়ে রেশমী কাপড় পোরে থেকো না, কারণ ওতে শরীরের উত্তাপ টেনে নেয় এবং উপক্রমের স্বাভাবিক আগ্রহ কমিয়ে দেয় *।

(১১) সুস্থাবস্থায় অনশন যদি বেশীদিন ধোরে চালানো যায়, তাহোলে ওতে কামাবেগ প্রশমিত করে বটে, কিন্তু প্রারম্ভে ও পথ্যারম্ভের পর প্রথম কয়দিন বেশ তীব্রভাবে জাগে।

(১২) কাঁচা অথবা সুরভিত নস্য আশ্চর্যভাবে রতিশক্তি কমিয়ে দেয়।

(১৩) একজন স্বাভাবিক সুস্থ পুরুষের চেয়ে একজন স্বাভাবিক সুস্থ রমণী রতিরণের শ্রম বেশী সহ্য কোরতে পারে; পুরুষের চেয়ে তাদের

* ডাঃ ভ্যান্ ডি ভেল্‌ডি পশমী বস্ত্রও পোরতে নিষেধ কোরেছেন তাঁর Ideal Marriage বইয়ে (৩০৯ পৃষ্ঠায়)।

শক্তিক্ষয় হয় কম; অতিরিক্ত উপভোগে নারীর ঝুঁকি পুরুষের তুলনায় অল্প। সুতরাং যৌনবোধে আপন পত্নীকে কখনো বেশী সচেতন কোরো না এবং সম্ভোগবিলাসের সর্ব স্তরের সঙ্গে তার অতি-পরিচয় ঘটিয়ো না। শেষটা নিজেই পস্তাবে।···কামাবেগকে সাধারণত মেয়েরা দমন কোরতে পারে অপেক্ষাকৃত অল্প আয়াসে বটে, কিন্তু ওকে ক্রমাগত শাণিত ও উদ্দীপ্ত কোরতে থাক্‌লে তারা ওর ওপর এক্তার হারায়। শেষে স্বামীর অশক্ততায় বা অবর্তমানতায় তারা ক্ষুব্ধ হয় ও পাত্রান্তরে সুখান্বেষণের জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়।

রতিরণে জয়ী কে

বাৎস্যায়ন বোলেছেন—রতি ব্যাপার সুখাবহ হোলেও ওটা যুদ্ধের সামিল। প্রত্যেকের মনেই অপর পক্ষকে পরাস্ত করার একটা বাসনা প্রচ্ছন্ন থাকে এবং প্রত্যেক পক্ষই নিজের জন্যে সুবিধাজনক ভঙ্গী গ্রহণ করে।···যুদ্ধ-ব্যাপারে দেখো, যারা প্রথমে পররাজ্য আক্রমণ করে, তারা যদি তাড়াতাড়ি শত্রুর নৈতিক বল ভাঙ্‌তে না পারে এবং পুনঃপুন আঘাত দিয়ে তাকে আত্মসমর্পণে বাধ্য কোর্‌তে না পারে, তাহোলে তার আঘাত হান্‌বার শক্তি ক্রমশ ফুরিয়ে আসে। শেষে সে পিছিয়ে এসে আত্মরক্ষণমূলক যুদ্ধ কোরতে প্রবৃত্ত হয়। নারীসঙ্গমে বীরপুরুষ অভিক্রম করে এবং অবলা নারীকে নিয়ে রেখে নিজে সক্রিয়তার ভূমিকা গ্রহণ করে। যে আঘাত পেয়েও টিঁকে থাকে, তার ভেতর নিভৃতে শুধু আঘাত সইবার বলই উপচিত হয় না—আঘাত দেবার বলও সঞ্চিত হয়। পুরুষ রণক্লান্ত হোয়ে পড়ে নারীর আগে। নারীর ইতিহর্ষ প্রায়ক্ষেত্রেই পুরুষের পরে আসে। পুরুষ যখন জয়গৌরবে রণক্ষেত্র হোতে অপসরণ কর্‌তে চায়, তখন কোন কোন আবেগমী নারী (যে এতক্ষণ প্রায় নিশ্চেষ্ট ছিল) গাঢ়তর আলিঙ্গনে তাকে বন্দী কোরে রাখে, পদদ্বয় বিক্ষেপ কোর্‌তে থাকে, তাকে দংশন করে,

স্বেদাক্ত হয়, তলদেশ হোতে তীব্র জঘনান্দোলন করে।···বাৎস্যায়ন এই রকম অবস্থায় নায়িকাকে "সঙ্কুক্ষমানা" বোলে অভিহিত কোরেছেন।

রতি-ব্যাপারে পুরুষ শ্রম করে বেশী, সুখ পায় কম। নারী শ্রম করে কম, সুখ পায় বেশী। পুরুষ যে সারবস্তু ত্যাগ করে নারী তা নিজের মধ্যে গ্রহণ করে, আর সে যে অসার বস্তু ত্যাগ করে (কখনো কখনো করেও না) সেটা তখনকার মতো তার নিজের মধ্যেই থেকে যায়। পুরুষের দানটাকে সে প্রায় অত্যন্ত ছোট বোলে অনুভব করে, আর নিজের দানটাকে সে অত্যন্ত বড় বোলে উপলব্ধি করে। নারী ইতিহর্ষ পায় তো ভালোই, না পেলেও সে পুরুষকে শ্রান্ত কর্‌ল ও তার সার বস্তু আহরণ কর্‌ল—এই সংবিদও খানিকটা তার গর্বিত আত্মপ্রসাদের খোরাক যোগায়। নিম্নতলশায়িনী হোয়েও কায়মনে এখানে নারীর জয়।

ইতিহর্ষ-লাভের প্রবণতাকে জোর কোরে চেপে রেখে নারী একাধিকবার পুরুষকে রতিরণে আহ্বান কোর্‌তে পারে। সকল পুরুষই চিরকাল সে আহ্বানকে সাদরে বরণ কোরতে পারে না এবং সকল ক্ষেত্রে শ্রমের দিগ্বলয়ে সুখের রশ্মি দেখ্‌তে পায় না। এইখানেই পুরুষের পরাজয়।···পুরুষের ক্ষণস্থায়ী পৌরুষ দেখে অনেক রসজ্ঞা নারী অতি দুঃখেও নিরালে হাসে; কারো হাসি অস্ফুট শব্দে ওষ্ঠের উপকূলে হিল্লোল তোলে। তৃপ্তির মধ্যেও অনেক পুরুষই যেন অনেকখানি ছোট হোয়ে যায়; মুখে তার হাসি ফোটে না, ক্লান্তির আবেশে সে তন্দ্রাতুর হয়। এটা যেন—যাকে ইংরাজিতে বলে 'Pyrrhic victory'। তাই বহু প্রাচীনকাল থেকে ল্যাতিন ভাষায় একটী প্রবাদ প্রচলিত আছে—*Post coitum omne animal triste*; রমণের পর প্রত্যেক পুংপশুই বিমর্ষ হোয়ে পড়ে!

এই দার্শনিক তত্ত্বটা কতখানি সত্য, তা' তোমরা স্ত্রীপুরুষে মিলে একটু ভেবে দেখো!···আজ না হয় দু'দিন পরে ভাব্‌লেও চোলবে।

অষ্টম বৈঠক

সম্প্রয়োগে-বৈচিত্র্যবিধান

বিখ্যাত জার্মান্ যৌনব্যাধিবিশেষজ্ঞ চিকিৎসাবিজ্ঞানী, ডাঃ ফুরব্রিঙের একবার প্রসঙ্গক্রমে বোলেছিলেন, "আমার কেস্-নোট্‌গুলো হাতড়িয়ে দেখ্‌তে পাই, তাতে আমার অসংখ্য রোগিরোগিনীদের দ্বারা এত রকম কায়দায় ও ভঙ্গীতে রতিক্রিয়া অনুষ্ঠিত হোয়েছে যার বাইরে আমি আর নতুন কিছু কল্পনা কোরতে পারি না।" সম্প্রয়োগের যে অতি-সাধারণ ও লোকপ্রসিদ্ধ সম্বেশন সর্বত্র প্রচলিত, তার পরিচয় তোমাদের এর আগেই দিয়েছি। অসাধারণ বোলে পরিচিত আরো নানারকমের ভঙ্গী পৃথিবীর বহুদেশে বহু জাতির বৈচিত্র্যপ্রিয় নরনারীর দ্বারা অকস্মাৎ লীলাচ্ছলে আবিষ্কৃত হোয়েছে ও আচরিত হোয়ে আস্‌ছে। আবার কতকগুলি ভঙ্গী যুগযুগান্ত থেকে কলারসিক বিশেষজ্ঞগণ উদ্ভাবন কোরে সাধারণ্যে প্রচার কোরে আসছেন। খৃষ্টজন্মের বহুশত বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষে ঔদ্দালকি শ্বেতকেতু রতিকালীন্ বিভিন্ন অঙ্গবিন্যাসের আবশ্যকতা স্বীকার কোরে গেছেন। বাৎস্যায়নের সময় এই সকল অঙ্গবিন্যাসের সংখ্যা আটচল্লিশে এসে দাঁড়ায়। কামসূত্রে এর অধিকাংশগুলি 'চিত্ররত' নামে একটি পৃথক পটলে উদ্ধৃত কোরে দেওয়া হোয়েছে।

অন্যান্য দেশে রতিভঙ্গীর বৈচিত্র্য-সাধন

খৃষ্টজন্মের ১৩০০ বছর আগে মিশরে চৌদ্দ প্রকার শৃঙ্গারপদ্ধতির চলন ছিল—তার প্রমাণ প্রাচীন পুঁথিপত্র থেকে পাওয়া গেছে। দক্ষিণ-ইউরোপে প্রাচীনকালে অনেক সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলা প্রেমকলা ও প্রিয়-সঙ্গমের রীতিপদ্ধতি সম্বন্ধে গাথা ও গীতিকাব্য রচনা কোরে গিয়েছেন।

ষোড়শ শতাব্দীতে রাফাএলের অন্যতম মন্ত্রশিষ্য, জুলিও রোম্যানো সম্রাট নেরোর বিলাসপ্রাসাদের কক্ষপ্রাচীরে অঙ্কিত দ্বাদশ প্রকার শৃঙ্গারের প্রতিচিত্র এঁকে নিয়ে তাতে নিজের কল্পনাপ্রসূত আরো চারটি নূতন ভঙ্গী সংযোজন কোরেছিলেন। এই ষোলোখানি বর্ণবহুল রাগোদ্দীপক চিত্রকে ভাষার ভাণ্ডে সমৃদ্ধ করবার জন্যে রোমানো তাঁর বন্ধু, তদানীন্তন কালের লোকপ্রিয় প্রেমের কবি, আরেতিনোকে দিয়ে ষোলোটি মনোরম সনেট্ লিখিয়ে নিয়েছিলেন। রোম্যানো শেষ বয়সে তাঁর কামকলা বিষয়ক চিত্রসংখ্যা বাড়িয়ে পঁয়ত্রিশে দাঁড় করিয়েছিলেন। আরেতিনোও ঐ সঙ্গে সনেটের সংখ্যা পঁয়ত্রিশ কোরেছিলেন। তাঁদের মৃত্যুর পর রোম্যানোর ছবির সংখ্যা ও সনেটের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় ছত্রিশে।

কিছুকাল আগে ফর্বার্গ্ নামে সমাজবিজ্ঞানের জনৈক ধুরন্ধর জগতের আধুনিক ও প্রাচীন গ্রন্থ ঘেঁটে—বিভিন্ন দেশের প্রেমিকসমাজে আয়াসসাধ্য অনুসন্ধান কোরে নব্বই প্রকার রতিরীতির পরিচয় সংগ্রহ কোরেছেন। তারপর এই শতাব্দীর গোড়া থেকে পারি ও মাদ্রিদ থেকে অজ্ঞাতনামা প্রাচীন পণ্ডিতদের নাম দিয়ে, ছদ্মনামা তথাকথিত প্রত্নতাত্ত্বিক ও পেশাদার লেখকদের যে সব কামকলা বিষয়ক কেতাব প্রকাশিত হোয়েছে, তার কতকগুলির মধ্যে একশো বা একশো-একটি ভঙ্গীর নাম ও বর্ণনা দেওয়া আছে। গোপনে প্রচারিত কোন কোন বহুমূল্য পুস্তকে কতকগুলি রেখাচিত্র বা ফটোও সংযোজিত করা হোয়েছে। এই সকল ভঙ্গীর অধিকাংশই সাধারণ স্ত্রীপুরুষের তো বটেই—বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন হঠযোগীরও সাধ্যায়ত্ত নয়।

হ্যাভলক্ এলিস অনেক ভেবেচিন্তে ও সন্ধান নিয়ে মাত্র আটচল্লিশটি সম্ভোগমুদ্রা সুকর ও অধিগম্য বোলে অভিমত দিয়েছেন। বাৎস্যায়নও আটচল্লিশটি মুদ্রার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন; কল্যাণমল্ল ও কোক্কক মাত্র বাত্রশটির উল্লেখ কোরেছেন। অটো অ্যাড্‌লার, নর্ম্যান্ হাইম্‌স্,

নর্মান্ হেয়ার, হেলেনা রাইট্, মেরি স্টোপ্স্, ডিকিন্সন্, এলিস্, ভ্যান্ ডি ভেল্ডি প্রমুখ পাশ্চাত্ত্য প্রেমবিজ্ঞানীদের অনেকেই এই সকল মুদ্রার মধ্যে ছ' থেকে দশটি দফা মাত্র সাধারণ দম্পতির পক্ষে পালনীয় বোলে অনুমোদন কোরেছেন। আমরা কামসূত্র থেকে বাছা বাছা কয়েকটি মাত্র সম্বেশনের উল্লেখ কোরে আমাদের পালা শেষ করব।

প্রথমেই সংক্ষেপে বোলে নিই—লৌকিক ভঙ্গী বাদ দিয়ে পতিপত্নীর মাঝে মাঝে অন্যবিধ ভঙ্গী গ্রহণের সার্থকতা কি। পাঁচ দিক্ দিয়ে এর সার্থকতা প্রমাণ করা যায় :—

(১) একঘেয়েমি ভাঙার সুযোগ দেয়, সৌহিত্য (surfeit) থেকে দম্পতিকে রক্ষা করে।

(২) দম্পতির একজনের বা উভয়েরই রতিসামর্থ্য সাময়িকভাবে কিছু বৃদ্ধি করে ; এক পক্ষ বা উভয়পক্ষের ইতিহর্ষ-প্রাপ্তি বিলম্বিত করে।

(৩) ভাবগতভাবে একের মাধ্যমে বহু-সম্ভোগের সংবৃত প্রবৃত্তিকে প্রশমিত করে।

(৪) একের বা উভয়ের ধাতুপ্রকৃতিগত বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গগত অসুবিধা ও বৈষম্য দূর করে ; সক্রিয় পক্ষকে নিষ্ক্রিয় হোতে ও নিষ্ক্রিয় পক্ষকে সক্রিয় হবার অবসর প্রদান করে।

(৫) গর্ভোৎপাদন অথবা গর্ভনিবারণ সুসাধ্য করে।

উত্তান শয়ন-ভঙ্গী

সম্বেশন ও যন্ত্রযোগকে একত্রে 'বন্ধ' বলা যায়, তা তোমাদের আগেই বোলেছি। স্ত্রীলোকের উত্তান হোয়ে শয়ন ও পুরুষের তদুপরি শয়নের যে ভঙ্গী, সেইটিই অতি সাধারণ ভঙ্গী তা তোমাদের অজানা নয়। কিন্তু এই ভঙ্গীর মধ্যেও হস্তপদাদি রক্ষার বিভিন্নতায় বিভিন্ন বন্ধ উৎপাদনের সম্ভাবনীয়তা আছে। এইরূপ শয়নবিন্যাসলব্ধ কয়েকটি বন্ধের কথা

এই অধ্যায় হবে
— বইটি ছুটি copy
এক সঙ্গে কীনা।